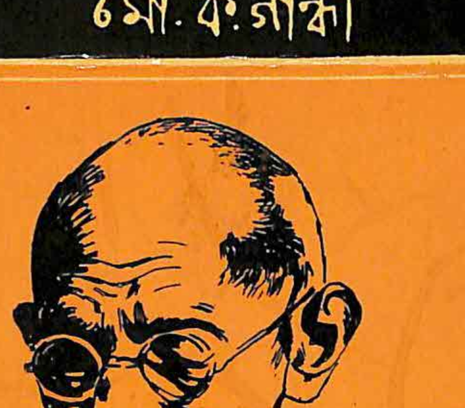


# সংক্ষিপ্ত আত্মকথা

মো. ক. গান্ধী



মহাত্মা গান্ধী

# সংক্ষিপ্ত আত্মকথা

অনুবাদক

রঘুনাথ মাইতি

গান্ধী-শতবর্ষ প্রকাশন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা ৭০০ ০০৭

গান্ধী-শতবর্ষপ্রারম্ভ সংস্করণ : অক্টোবর ২, ১৯৬৬

নূতন মুদ্রণ : অক্টোবর ২, ১৯৮৫

দাম : ১০·০০



৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও সাধারণ প্রেস, ১৫এ ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত

## প্রকাশকের নিবেদন

গান্ধীজী ১৯২৫ সালে 'নবজীবন' পত্রিকায় নিজের জীবন-কাহিনী লিখতে সুরু করেন। সত্যরূপী ভগবানকে লাভ করাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য—তাই তিনি প্রতিটি কাজ সত্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে করেন। আত্মজীবনীকে সেইজন্যই তিনি "আমার সত্যের প্রয়োগ" বলেন। এই বইখানি জীবনী-সাহিত্যে অতুলনীয়। নানা ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে।

কিন্তু আরও প্রচারের যথেষ্ট অবসর আছে। মূল বইখানি বা তার অনুবাদ বেশ বড়, সকলের এত বড় বই পড়ার সময় হয় না। সেজন্য মহাদেব দেশাই ও শ্রীহরি ভট্ট উপাধ্যায় ১৯৩৯ সালে হিন্দীতে "সংক্ষিপ্ত আত্মকথা" নাম দিয়ে গান্ধীজীর আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "সস্তা সাহিত্য মণ্ডল"—"নঈদিল্লী" থেকে বের করেন। ঐ বইয়ে মূল আত্মকথার ভাষা যথাসম্ভব বজায় রেখে এবং বড় বড় বর্ণনা বাদ দিয়ে সারাংশ মাত্র দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহের মূল ঘটনাগুলিও ওতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

বাঙলাতেও সর্বসাধারণের জন্য গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত আত্মকথা প্রচার করা আবশ্যক মনে হ'ল। "সস্তা সাহিত্য মণ্ডল" থেকে প্রকাশিত উক্ত সংক্ষিপ্ত আত্মকথাকেই অবলম্বন করে মূলের ভাব ও ভাষা যথাসম্ভব অব্যাহত রেখে ক্ষুদ্র আকারে এই পুস্তকখানি বের করা হ'ল। উদ্দেশ্য এই—যাতে অতি অল্পশিক্ষিত লোকও অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে গান্ধীজী সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারেন।

গান্ধীজী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ও খুব সংক্ষেপে নিজের কথা বলেন। তিনি যা লিখেছেন—তাকে সংক্ষিপ্ত করে বলায় বিপদ আছে—ভুলত্রুটির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, বর্তমান সংস্করণে সেরূপ কোন ভুল কারো চোখে পড়লে তিনি যেন অনুগ্রহ করে তা দেখিয়ে দেন। তাহ'লে পরবর্তী সংস্করণে সে ভুল শোধরাবার সুযোগ থাকবে।

আর একটি কথা, গান্ধীজীর আত্মজীবনী অসহযোগের দ্বার-দেশে এসেই থেমে গেছে। পরবর্তী কাহিনী ভারতের জন-জাগরণেরই কাহিনী। ভারতের মতোই তা বিশাল ও বিচিত্র। এ যাবৎ তার কোন বিশ্বাসযোগ্য ও ধারাবাহিক বর্ণনা পুস্তকাকারে বেরোয় নি। কিন্তু আমাদের স্মৃতির মধ্যে এখনও তা সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে। তবু গ্রন্থাকারে তার প্রকাশ হওয়া অত্যাবশ্যক।

এই পুস্তকখানি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ গান্ধীবাদী গঠনকর্মী কাঁথির শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মাইতি মহাশয়।

গান্ধী শতবর্ষের প্রারম্ভে পুস্তকখানি প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

বিনীত

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক



প্রার্থনারত গান্ধীজী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতন, ১৯৫৪

আমার জীবনই আমার বাণী।

মো. ক. গান্ধী

# সূচীপত্র

## প্রথম ভাগ


| | | |
|---|---|---|
| বাল্য | ... | ৯ |
| কৈশোর | ... | ১৩ |
| ধর্মের জ্যোতি | ... | ১৭ |
| বিলাত-যাত্রা ও প্রথম অভিজ্ঞতা | ... | ১৯ |
| প্রতিজ্ঞার শুভ পরিণাম | ... | ২১ |
| সভ্য হওয়ার চেষ্টা | ... | ২২ |
| সরলতার দিকে | ... | ২৩ |
| প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা | ... | ২৫ |
| ব্যারিস্টার | ... | ২৮ |
| দক্ষিণ আফ্রিকায় | ... | ২৯ |
| সেবার কার্যে হাতেখড়ি | ... | ৩৩ |
| ঝড়ের আভাস | ... | ৩৬ |
| কষ্টি-পাথর | ... | ৩৮ |
| সেবাভাব ও সরলতা | ... | ৪৩ |
| একটি পুণ্যস্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত | ... | ৪৫ |
| বুয়োর যুদ্ধ | ... | ৪৭ |
| স্বদেশ-যাত্রা | ... | ৪৯ |
| আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় | ... | ৫২ |
| একটি পুস্তকের চমৎকারিত্ব | ... | ৫৪ |
| ফিনিক্স ও জোহান্সবার্গ | ... | ৫৬ |
| জুলু বিদ্রোহ | ... | ৫৯ |
| সারা জীবনের সংকল্প | ... | ৬০ |
| গৃহে সত্যাগ্রহ | ... | ৬২ |
| ওকালতির স্মৃতি | ... | ৬৫ |

## দ্বিতীয় ভাগ


| | | |
|---|---|---|
| সত্যাগ্রহের জন্ম | ... | ৬৭ |
| আবার সত্যাগ্রহ | ... | ৭৪ |
| টলস্টয় আশ্রম | ... | ৭৫ |
| ভালোমন্দের মিল | ... | ৭৮ |
| সত্যাগ্রহে ভগিনীদের অংশ | ... | ৮০ |
| সত্যাগ্রহে শ্রমিকদের অংশ | ... | ৮৫ |
| আমাদের অভিযান | ... | ৮৭ |
| সত্যাগ্রহের জয় | ... | ৯২ |
| গোখ্‌লের সঙ্গে বিলাতে | ... | ৯৪ |
| স্বদেশ-যাত্রা | ... | ৯৭ |
| ভারতবর্ষে : | | ৯৯ |
| গোখ্‌লের সঙ্গে পুণায় | ... | ৯৯ |
| বিরাম-গাঁওয়ের শুল্ক | ... | ১০০ |
| শান্তিনিকেতন | ... | ১০১ |
| তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী | ... | ১০২ |
| আমার চেষ্টাচরিত্র | ... | ১০৩ |
| সত্যাগ্রহাশ্রম স্থাপন | ... | ১০৪ |
| কষ্টিপাথরে | ... | ১০৪ |
| গিরিমিট প্রথা | ... | ১০৬ |
| চম্পারণ সত্যাগ্রহ | ... | ১০৭ |
| শ্রমিকদের সঙ্গে | ... | ১১৩ |
| রাউলাট আইন ও সত্যাগ্রহ | ... | ১১৫ |
| হিমালয়-তুল্য ভুল | ... | ১২১ |
| পাঞ্জাবে | ... | ১২২ |
| কংগ্রেসে প্রবেশ | ... | ১২৩ |
| মিল মালিকদের সঙ্গে | ... | ১২৪ |
| পূর্ণাহুতি | ... | ১২৫ |

# ১

## বাল্য

আমার পিতা কাবা গান্ধীর টাকা জমাবার লোভ ছিল না। আমাদের জন্য তিনি অল্পই রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল প্রচুর। তিনি অনায়াসে অনেক কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতেন ও হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করতেন। ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর প্রায় ছিল না, কিন্তু সাধারণ ধর্মজ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন কুটুম্বপ্রিয়, সত্যপ্রিয়, সাহসী, উদার অথচ কোপনস্বভাব— ঘুষ কখনো নিতেন না ; তাই ন্যায়বিচার করতে পারতেন।

পিতা ছিলেন রাজকোট রাজ্যের দেওয়ান। রাজ্যের হিতের জন্য একবার তিনি রাজকোটে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে হাজত ভোগ করেছিলেন, তবু মাপ চাননি।

মা সর্বদা পূজাপাঠ নিয়ে থাকতেন, প্রায়ই ব্রত ও উপবাস করতেন। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে উপবাস করা তাঁর অভ্যাসগত ছিল। চাতুর্মাস্যের সময় তিনি সূর্য না দেখে ভোজন করতেন না। এক-একবার ঐ সময় বর্ষাকাল পড়ায় পরপর কয়েক দিন সূর্যের মুখ দেখা যেত না, তাঁরও খাওয়া হ'ত না।

মার বুদ্ধি ছিল প্রখর, কাজকর্মে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ, মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেতেন। সেখানে ঠাকুরসাহেবের বিধবা মায়ের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হ'ত, তার কিছু কিছু এখনো আমার মনে পড়ে।

আমার জন্ম হয় সম্বৎ ১৯২৫, ১২ই আশ্বিন ( ইং ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর ) পোরবন্দর বা সুদামাপুরীতে। শৈশব পোরবন্দরে কাটে। সেখানে পাঠশালায় সামান্য কিছু শিখি।

পিতা যখন বিচারকের পদ নিয়ে রাজকোটে যান, তখন আমার বয়স ৭ বছর। রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি হয়ে অতি সাধারণ ছাত্রের মত কয়েক বছর কাটাই। হাই-স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় আমার বয়স হয় বারো।

আমি খুব লাজুক ছিলাম। পাঠশালায় নিজের পড়াশুনো নিয়েই থাকতাম। শিক্ষককে কখনো ফাঁকি দিতাম না। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম না, স্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পালাতাম। আমার ভয় হ'ত, পাছে কেউ আমাকে নিয়ে মজা করে।

পাঠশালায় পড়বার সময়কার একটি কথা উল্লেখযোগ্য। একবার ইন্‌স্পেক্টর জাইল্‌স্ সাহেব স্কুল পরিদর্শন করতে এসে বানান পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার সময় মাস্টারমশায় আমাকে সামনের এক ছেলের নকল করতে ইশারা করেন। আমি তা করিনি বলে বোকা প্রমাণিত হই এবং পরে সেজন্য মাস্টারমশায়ের কাছে বকুনি খাই। তাঁর এই অন্যায় আচরণ দেখেও তাঁর উপর আমি

শ্রদ্ধা হারাইনি। আমি বরাবরই গুরুজনের কথা শুনে চলতাম, কিন্তু তাঁদের দুষ্কর্মের অনুসরণ করতাম না।

মাস্টারমশায়দের সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি আমার পাঠ্য পুস্তকগুলিই ভাল করে পড়তাম—অন্য বই পড়বার সময় পেতাম না। তবু একবার বাবার কেনা 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক একটি নাটক পড়ে আমার খুব মনে লাগে। ফেরিওয়ালাদের বায়স্কোপে শ্রবণের ছবি দেখি। পিতৃভক্ত শ্রবণ বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে বাঁকের দু'ধারে তুলে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখে শ্রবণের মত সন্তান হওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই সময় হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হই। হরিশ্চন্দ্র সত্যের জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করে নিচ্ছেন—এদৃশ্য দেখে আমি চোখের জল ফেলতাম। হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হোন্ বা না হোন্ আমার কাছে তাঁরা জীবন্ত সত্য—আমার হৃদয়ে তাঁরা চিরকালের জন্য স্থান পেয়েছেন। এখনো বোধহয়, ঐ দু'টি নাটক দেখলে আমার চোখে জল আসবে।

হাই-স্কুলে যখন ঢুকি, তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার দুই দাদাও ঐ স্কুলে পড়তেন। বড়দা পড়তেন খুব উপরের শ্রেণীতে আর মেজদা আমার এক ক্লাস উপরে। মেজদার ও আমার বিয়ে এক সময়েই হয়েছিল। বিয়ের ফলে মেজদার পড়া বন্ধ হ'ল, আমারও একটি বছর মাটি হ'ল। অল্পবয়সে বিয়ে করার ফলে কত যুবকেরই না সর্বনাশ হয়!

হাই-স্কুলে আমি পড়াশুনোয় ও আচরণে শিক্ষক মশায়দের

প্রশংসাই পেয়েছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় পুরস্কার এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মাসিক যথাক্রমে ৪৲ ও ১০৲ ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিলাম। ওতে কিন্তু আমার যোগ্যতার কিছু পরিচয় ছিল না। অল্প ছাত্রের মধ্যে দৈবাৎ বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিলাম।

পড়াশুনোয় ভালো হওয়ার জন্য আমার মনে কোন অভিমান ছিল না—কারণ সেরূপ আশা করতাম না। কিন্তু নিজের আচরণের দিকে আমার খুব লক্ষ্য ছিল, খারাপ কিছু করলেই আমার কান্না আসত। শিক্ষকমশায় আমার কোন ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবেন, এ আমি সহ্য করতে পারতাম না।

আমার তখন একটা ভুল ধারণা হয়েছিল যে, পড়াশুনোর সঙ্গে ব্যায়ামাদি করবার কোন মূল্য নেই। খেলাধূলো কুস্তিটুস্তিতে আমার রুচি ছিল না। পরে বুঝতে পারি যে, এই ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক। তবে কুস্তিকসরত না করা সত্ত্বেও আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি—তার কারণ আমি শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত খোলা হাওয়ায় প্রাতর্ভ্রমণ করে আসছি।

আর একটা ভুল ধারণার শাস্তি এখনো ভোগ করছি। হাতের অক্ষর ভালো করবার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। পরে সে ভুল বুঝতে পারি, কিন্তু আর শোধরানো সম্ভব হয়নি। সবাই যেন আমার উদাহরণ থেকে এ সম্পর্কে সাবধান হন। ভালো হাতের লেখা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।

জ্যামিতি ও সংস্কৃত ভাষা প্রথামত আমার খুব কঠিন মনে হয়েছিল, পরে ঐ দুটি ভালোই লাগে। সংস্কৃত ভাষায় রুচি ফিরিয়ে

আনবার জন্য পণ্ডিত কৃষ্ণশংকর পাণ্ডের কাছে আমি কৃতজ্ঞ; আমি বিশ্বাস করি, সংস্কৃত না শিখলে কোন হিন্দু ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমার ত মনে হয়, উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের পক্ষে নিজের মাতৃভাষা ছাড়া রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরেজী জানা উচিত। তা অসম্ভব নয়। একটি ভাষা ভালো করে জানলে অন্যগুলি জানা সহজ হয়ে যায়।

## কৈশোর

১৩ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। এত কম বয়সে বিয়ে করবার কথা ভেবে আজ লজ্জায় মুখ ঢাকতে ইচ্ছা করে। কোন যুক্তিতেই এরকম বাল্যবিবাহ সমর্থন করা যায় না।

এই সময় আমি হাই-স্কুলে পড়তাম। হিন্দুসমাজে বিয়ে ও পড়াশুনো এক সঙ্গে চলে।

এই সময়ের একটি দুঃখকর ঘটনা মনে পড়ে। আমার মেজদার সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। তার অনেক দোষ ছিল জানতাম—তবু তাকে শোধরাবার ইচ্ছায় তার সঙ্গ ছাড়তাম না। এজন্য আমার বড়দা, মা ও স্ত্রী তিনজনই খুব অসন্তুষ্ট হতেন। ঐ বন্ধুটি আমাকে মদ ও মাংস খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করত ও তার অনুকূলে অনেক যুক্তি দেখাত। মদ-মাংস না খাওয়ার জন্যই আমাদের

জাতি দুর্বল, ইংরেজরা মদ-মাংস খায় বলেই এত শক্তিমান,—এ সব কথা শেষ পর্যন্ত আমার মনে ছাপ দেয়। তা'ছাড়া বন্ধুটি মাংস খায় বলেই খুব সবল ও সাহসী হয়েছে—এরকম ধারণা আমার হয়। নিজে ছেলেবেলায় ভীরুস্বভাবের ছিলাম, তাই মাংস খেয়ে ওর মত সবল হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। অবশেষে একদিন গোপনে নদীর ধারে মাংস ও রুটি খেতে গেলাম। খাওয়ার সময় গা বমিবমি করতে লাগল, ফিরে এসে রাত্রিতে খুব অশান্তি বোধ করতে লাগলাম। ঘুম আসতে চায় না, স্বপ্ন দেখতে লাগলাম যেন ছাগলটা আমার শরীরে ঢুকে চেঁচাচ্ছে…। তবু ভাবলাম শরীরে শক্তি আনতে হ'লে মাংসাহার ত করতেই হবে। কাজেই নিরস্ত হলাম না।

বন্ধুটি মাংসকে রুচিকর করবার জন্য নানা রকমের রান্না করত, মাঝে মাঝে বড় বড় হোটেলেও নিয়ে যেত, বলবান্ ও সাহসী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে যা বলত তাই করতাম। কিন্তু বাপ-মাকে জানতে দিতাম না; এইভাবে এক বছর চলেছিল। ঐ এক বছরে মোট ৫।৬ বার মাংস খেয়েছি। প্রত্যেকবার লুকিয়ে মাংস খেয়ে এসে বাড়িতে কিছু খেতাম না। মা খেতে বললে 'খিদে নেই', 'শরীর ভাল নয়' ইত্যাদি মিছে কথা বলতাম, কিন্তু তাতে মনে ধাক্কা লাগত। মা-বাপকে ধোঁকা দিয়ে বলবান্ হওয়ায় লাভ কি? ক্রমে বিবেকের দংশন অসহ্য হয়ে উঠল; স্থির করলাম, মা-বাবা যতদিন থাকবেন, অন্তত ততদিন মাংস খাব না—এই বলে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলাম। আর জীবনে কখনো খাইনি।

মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেও বন্ধুটিকে ছাড়তে পারলাম না। সে আমাকে আরো অসৎ পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। তার প্ররোচনায় প্রায় ব্যভিচারী হতে বসেছিলাম, ভগবান বাঁচিয়েছেন। আমার ধর্মপত্নীর প্রতি অবিশ্বাসও ঐ সঙ্গীটিই জন্মিয়ে দিয়েছিল। এজন্য আজ ধিক্কার আসে। স্ত্রীকে যতদিন ভোগের বস্তু ভেবেছি, ততদিন এ অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে যায়নি। যখন পরজীবনে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিলাম, স্ত্রীকে সহধর্মিণীরূপে দেখলাম, তখনই এই সন্দেহের মূল নষ্ট হল।

বিয়ের একটু আগে হোক্ বা পরে হোক্ লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া অভ্যাস করেছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে খুব মজা লাগত। কাকা সিগারেট খেয়ে শেষে যেটা ফেলে দিতেন, তাই তুলে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতাম। তাতে তৃপ্তি হ'ত না, তাই মাঝে মাঝে চাকরদের পকেট থেকে ছু-এক পয়সা চুরি করে সিগারেট কিনে খেতে লাগলাম। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ চলল। বড়রা পয়সা আছে বলে সিগারেট খেতে পারে আর আমি পারি না—এজন্য নিজের উপর ধিক্কার এল। এমনভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল মনে করলাম। কিছু ধুতুরার বীজ সংগ্রহ করলাম ও কেদারজীর মন্দিরে দেবতা দর্শন করে নির্জনে বিষ খেতে গেলাম। কিন্তু সাহস হল না, ২।৪টা বীজ খেয়ে আর খেলাম না। বুঝলাম, আত্মহত্যার কথা বলা যত সোজা, করা তত সোজা নয়।

আত্মহত্যা করা হ'ল না, কিন্তু এরই ফলে সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস চিরতরে চলে গেল।

এ হ'ল ১২।১৩ বছর বয়সের কথা। ১৫ বছর বয়সের সময় একবার মেজদা প্রায় ২৫৲ কর্জ করেছিলেন। সেই কর্জ শোধ করবার জন্য আমি ও তিনি একমত হয়ে তাঁর হাতের সোনার বালা থেকে প্রায় ১ তোলা সোনা কেটে নিয়ে বিক্রি করে দিই। কিন্তু এই ব্যাপারে মনে খুব আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। বাবাকে ফাঁকি দিয়ে এতটা করায় অশান্তির সীমা থাকল না। অনেক ভেবে তাঁকে সব কথা খুলে বলাই ভাল মনে করলাম। একদিন একটা চিঠিতে সব কথা লিখে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তখন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, আমার চিঠি পড়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। মনে করেছিলাম খুব বকবেন, মাটিতে কপাল ঠুকবেন। খুব রেগে গেলে তিনি এইরকমই করতেন, কখনো মার দিতেন না—কিন্তু সে-সব কিছুই করলেন না। আমি দোষ স্বীকার করেছি, তাতেই আমাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করলেন ও আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। এই ব্যাপারে অহিংসার যে জয় সূচিত হয়েছিল, আমার মনের উপর তার গভীর প্রভাব অঙ্কিত হয়ে গেল। অকপটে দোষ স্বীকার করাই যে অপরাধক্ষালনের সর্বোত্তম পন্থা, তাই শিখলাম।

## ধর্মের জ্যোতি

বাবা ও মা বৈষ্ণব মন্দিরে যেতেন। শিবের মন্দিরে, রামজীর মন্দিরেও যেতেন, বাবার কাছে জৈন সাধুরা আসতেন। মুসলমান ও পার্শী বন্ধুরাও আসতেন। তাঁদের সঙ্গে বাবার যখন ধর্মচর্চা হত, তখন আমিও শুনতাম। এই সব কারণে হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের প্রতি এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি আমার সমান শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তখন ঈশ্বরের সম্পর্কে ধারণা বিশেষ কিছু হয়নি, কিন্তু এ কথা বুঝেছিলাম যে, সংসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর নীতিমাত্রের মূল হল সত্য। সেই সত্যের খোঁজ বরাবর চলেছে; এখনো চল্‌ছে। ক্রমে সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ সময় একটি কবিতায় শত্রুরও উপকার করার ভাব মনের মধ্যে দৃঢ় হয়। কবিতাটি এই:

যে তোমারে দেয় জল—অন্ন দিয়ে শোধ ঋণ তার,
প্রণতি করহ তারে, যে তোমারে করে নমস্কার।
এক কড়ি পাও যদি—মোহরেতে কর প্রতিদান,
প্রাণ যে বাঁচালো তব—তার তরে দাও তুমি প্রাণ।
কথায়, মনে ও কাজে একগুণে দশগুণ দাও,
মন্দের কর ভালো, নিজগুণে বিশ্ব জিনে নাও।

১৮৮৫ সালে পিতার মৃত্যু হয়। পরে ১৮৮৭ সালে আমি ম্যাট্রিক পাশ করি। অভিভাবকদের ইচ্ছামত ভবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হই। ওখানে আমি মুস্কিলে পড়লাম।

অধ্যাপকদের বক্তৃতা ভালো লাগত না, বোঝাও যেত না। তাতে অধ্যাপকদের কোন দোষ ছিল না, আমিই খুব কাঁচা ছিলাম।

প্রথম টার্ম শেষ করে যখন বাড়ি গেলাম, তখন আমাদের পরিবারের এক পুরাতন বন্ধু মাধবজী দুবে পরামর্শ দিলেন যে, বাবার গদী পেতে হলে আমার বিলাত গিয়ে ৩ বছর পড়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসা ভাল। রোগী যেমন চায়—বৈদ্য সেইরকম পথ্যেরই ব্যবস্থা দিলেন, আমিও খুব খুশী হলাম। কিন্তু বড়দা চিন্তিত হলেন, কি করে আমার খরচ যোগাবেন—এত কম বয়সে বিলেত পাঠান ঠিক কি-না? মার ত ভালই লাগল না। তাঁর ভয় ছিল, বিলেত গেলে যুবকরা মদ-মাংস খায়, বিগড়ে যায়। আমি বোঝালুম, মা, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি শপথ নিয়ে বলছি বিলেতে গিয়ে মদ-মাংস, মেয়ে-মানুষ স্পর্শ করবো না। মা বললেন, "তোকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু দূর দেশে তোর কখন কি হবে ভেবে পাচ্ছি না, আমি বেচরজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করি।" বেচরজী স্বামী ছিলেন আমাদের হিতৈষী জৈন সাধু। তিনি বিলেত যাওয়ার সপক্ষেই মত দিলেন। কাজেই মারও অনুমতি পাওয়া গেল।

রাজকোট হাই স্কুলের ছাত্ররা আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল; মনে আছে, তাদের কাছে একটা লিখিত উত্তর দিতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরছিল, শরীর কাঁপছিল।

## বিলাত যাত্রা ও প্রথম অভিজ্ঞতা

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে যাত্রা করলাম। জাহাজে স্টুয়ার্ডের ( ভোজন-কক্ষের পরিচারকের ) সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতাম। আমার সঙ্গে রাজকোটের এক উকিলবাবু ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে বিলাত যাচ্ছিলেন। তিনি ও খালাসীর দল ছাড়া আর সবাই ছিল ইংরেজ, ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় হত। ওঁদের কথা বুঝতে পারতাম না, বুঝলেও উত্তর যোগাত না। কাঁটাচামচের ব্যবহার জানতাম না, কোন্ খাদ্যে মাংস নেই জিজ্ঞেস করতে সাহস হত না, এজন্যে খাওয়ার টেবিলে যেতাম না, কুঠরিতেই খেয়ে নিতাম। সঙ্গে যে মিঠাই ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলাম, তাই খেয়ে দিন কাটাতাম। ডেকে যখন লোকজন কম থাকত, তখনই এক আধবার যেতাম। সঙ্গী উকিলবাবু আমাকে ইংরেজী বলবার জন্যে উৎসাহিত করতেন ; কিন্তু আমি কিছুতেই সংকোচ ত্যাগ করতে পারতাম না।

একদিন এক ইংরেজ ভদ্রলোক সেধে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন ও আমি মাংস খাই না শুনে বললেন যে, বিলেতে গিয়ে মাংস না খেলে চলবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, “যদি তাই হয়, তাহলে বরং দেশে ফিরে আসব, তবু মাংস খাব না।”

অবশেষে সেপ্টেম্বরের শেষ দিনে বিলেতে গিয়ে পৌঁছলাম। আমার কাছে চারজনের নামে পরিচয়পত্র ছিল। তাঁদের নাম—

ডাঃ প্রাণজীবন মেহ্‌তা, দলপত রাম শুক্ল, প্রিন্স রণজিৎ সিংহ ও দাদাভাই নওরোজী। সাদামটন বন্দরে নেমে ডাঃ মেহ্‌তার কাছে তার করেছিলাম। আমি ও মজুমদার (উকীল) ভিক্টোরিয়া হোটেলে গিয়ে উঠলাম। মেহ্‌তাজী সেখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন ও বিলিতী শিষ্টাচার সম্পর্কে অনেক কথা বললেন, আমার সে সব জানার খুবই প্রয়োজন ছিল।

এক সিন্ধী ভদ্রলোক মাল্টা থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। বিলেত সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি আমার থাকবার জন্যে দুটি কামরা ভাড়া করে দিলেন। আমি হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সেখানে গেলাম। প্রথমটা খুব মুস্কিলে পড়লাম। কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় জানি না। কেবলই ভয় হয়, হয়তো শিষ্টাচারে ত্রুটি হচ্ছে। কোনও খাবার ভাল লাগে না। যা খেতে চাই তা পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা রুচিকর হয় না। দেশের কথা—মায়ের কথা, অন্য আত্মীয়স্বজনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি হলে কান্না সুরু হয়, ঘুম পায় না, মনের দুঃখ জানাবার লোক ছিল না। এই কারণে আমার অবস্থা সাপের ছুঁচো গেলার মত হয়ে উঠল। বিলেতে থাকাও অসহ্য মনে হল, ওদিকে দেশে ফেরবারও উপায় নেই। আমাকে ত তিন বছর বিলেতে থাকতেই হবে!

## প্রতিজ্ঞার শুভ পরিণাম

ডাঃ মেহ্‌তা একদিন আমার বাসায় এলেন। ঘর দেখে তাঁর পছন্দ হল না। তিনি বললেন,—"এখানে থাকা চলবে না। বিলেতে এসে শুধু বই পড়ার চেয়ে এখানকার চালচলন শেখা বেশী দরকার, এজন্যে আমি তোমাকে আপাতত একটি পরিবারে রাখা ঠিক করেছি। সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব।" তাঁর কথা মেনে নিলাম ও নূতন জায়গায় গেলাম। বাসার কর্তা আমাকে নিজের ভাইএর মত রাখলেন, আমার সুখসুবিধা দেখতে লাগলেন ও আমাকে ইংরেজী আদবকায়দা শেখালেন; কিন্তু খাওয়ার অসুবিধা থেকেই গেল—লঙ্কা, নুন ও মসলাহীন তরকারি মুখে রুচল না। সকালে যবের ক্ষুদ সিদ্ধ খেলে পেট ভরে যেত, কিন্তু দুপুরে ও সন্ধ্যায় পেট ভরত না।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক মাংসাহারের জন্যে আমাকে প্রলুব্ধ করতেন, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞার বিষয় ব'লে রেহাই পেতাম। সব যুক্তির আমার একমাত্র উত্তর ছিল—"না"। তিনি বেন্থামের বই পড়িয়ে আমার মত বদলাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি সানুনয়ে বললাম, "আপনার যুক্তি আমি মানি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না, আমাকে মূর্খ বা একগুঁয়ে ভেবে এ বিষয়ে মাপ করুন।" সেই অবধি তিনি আমাকে মাংস ধরাবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। তিনি নিজে সিগারেট ও মদ খেতেন, কিন্তু আমাকে খেতে নিষেধ করেছিলেন। এইভাবে এক মাস কাটল।

## সভ্য হওয়ার চেষ্টা

গৃহস্বামী বন্ধুটি আমি মাংস না খাওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন; কারণ, তিনি ভেবেছিলেন মাংস না খেলে আমি দুর্বল হব; শুধু তাই নয়, বোকা থেকে যাব। আবার আমাকে নিরামিষাহার বিষয়ক বই পড়তে দেখে তিনি আরও চিন্তিত হলেন, ভাবলেন—এই প্রকারের বই পড়ে আমি পাগল হয়ে যাব, পরীক্ষা দিতে দিতে আমার জীবন ব্যর্থ হবে, আমি একটা পণ্ডিতমূর্খ হব মাত্র।

যাতে আমাকে কেউ জংলী না ভাবে, সেজন্যে ইংরেজ-সমাজের সভ্যতা শিখব স্থির করলাম। বোম্বাই ফ্যাসানের পোশাক ছেড়ে বিলেতী ফ্যাসানের হ্যাটকোট ইত্যাদি তৈরি করালাম। বড়দা ছিলেন খুব সাদাসিধে ও স্নেহশীল। তাঁকে চিঠি লিখে আমার সোনার ঘড়িচেন আনালাম, টাই বাঁধার কৌশল শিখলাম। দেশে শুধু দাড়ি কামাবার দিন আয়না দেখতাম, এখন রোজ বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধা ও চুল বাগানোর জন্যে দশ দশ মিনিট কেটে যেত। এদিকে আবার আমার চুল ছিল খোঁচা খোঁচা, তাকে ঠিক করবার জন্যে রোজ বুরুশের সংগে লড়াই করতে হত। ভদ্র সমাজে চুল ঠিক রাখবার জন্যে সর্বদা মাথায় হাত চালাতে হত।

শুধু এতেই ত সভ্য হওয়া যায় না! নাচ জানা চাই, ফরাসী ভাষা ভাল জানা চাই। ইউরোপে ঘোরার ইচ্ছে ছিল, সেজন্যেও ফরাসী ভাষা জানা দরকার। নাচের ক্লাসে ভর্তি হলাম, ৩ মাসের

জন্যে প্রায় ৪৫ টাকা ফী দিলাম, প্রায় তিন সপ্তাহে ৫।৬টি পাঠ শিখেছিলাম। পা ঠিক তালে পড়ত না, পিয়ানোর বাজনার তালে তালে নাচতে পারতাম না। এখন আমার অবস্থা সেই বাবাজীর মত হল, যিনি এক কৌপীনের জন্যে বিড়াল পুষতে গিয়ে সমগ্র সংসার টেনে এনেছিলেন। ৪৫ টাকা দিয়ে একটা বেহালা কিনলাম স্বরতালের জ্ঞান পাওয়ার জন্য ; বক্তৃতা দেওয়া শেখাবার জন্যে আর একজন শিক্ষক ধরলাম। তাঁকে এক গিনি ভেট দিলাম। বক্তৃতা শেখার জন্যে কিছু বইপত্রও কিনলাম···।

অবশেষে চৈতন্য হল, ভাবলাম, এসব শিখে আমার কি হবে ? আমি ত আর চিরকাল বিলেতে থাকব না। আমি এসেছি লেখাপড়ার জন্যে, সেই আমার কাজ। নিজে সদাচারে থেকে যদি আমি সভ্য না হই তো সভ্য না হওয়া ভাল। অতঃপর নাচ শেখা, বেহালা শেখা ও বক্তৃতা শেখা ছেড়ে দিলাম। সভ্যতা শেখার পাগলামি আমার মাস তিনেক ছিল ; কিন্তু পোশাকের জৌলুস চলেছিল কয়েক বছর।

## সরলতার দিকে

সভ্য হওয়ার মোহে কিছু বাজে খরচ করলেও আমি বেহিসেবী ছিলাম না ; সর্বদা সংক্ষেপে চালাতে চেষ্টা করতাম। রোজ খুঁটিনাটি হিসেব লিখতাম, যাতে ১৫ পাউণ্ডের বেশী খরচ না হয় সে দিকে নজর ছিল। ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস থাকবার জন্যে পরবর্তী

জীবনে সার্বজনিক ব্যাপারে খুব কম খরচে কাজ চালিয়েছি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে তার পরিষ্কার হিসাব দিতে পেরেছি। আমার পরিচালনায় যতগুলি আন্দোলন হয়েছে কোথাও কর্জ করতে হয়নি, বরং কিছু বেঁচেছে।

আমার খরচ অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া ঠিক করলাম। পরিবারে থাকলে কিছু-না-কিছু বেশী খরচ হয় বলে পৃথক কুঠরি ভাড়া নেওয়া ভাল মনে হ'ল। তা ছাড়া এও ঠিক করলাম যে, প্রয়োজন অনুসারে এবং অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে মাসে মাসে পাড়া বদল করা দরকার। গাড়ি চড়া প্রায় ছেড়ে দিলাম। হেঁটে যাতায়াত করায় খরচ তো বাঁচলই, বেড়াবার কাজও হল। এই অভ্যাস করবার ফলে বিলাতে আমার বিশেষ কোন অসুখ হয়নি।

পরিবারে থাকা ছেড়ে দিয়ে দু'টি কামরা ভাড়া নিলাম ; এ হল আমার দ্বিতীয় পরিবর্তন, এইভাবে আমার খরচ প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল।

ব্যারিস্টারি পাশ করবার জন্যে খুব খাটুনির দরকার ছিল না, অনেক সময় হাতে থাকত। সেজন্যে আরো কিছু লেখাপড়া করা ভাল মনে করলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া স্থির করে একটা স্কুলে ভর্তি হলাম, এই পরীক্ষা আমার পক্ষে খুব শক্ত ছিল, সেজন্যে খুব পরিশ্রম করতে হত। পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় ফেল হই। এতে দুঃখ হল, কিন্তু হার মানলাম না, ভাল করে ল্যাটিন শিখব ঠিক করলাম। পরীক্ষা

দেওয়ার জন্য তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনে আরো সাদাসিধে ভাব আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম, দাদার উদারতা ও সাংসারিক অসচ্ছল অবস্থার কথা ভেবে খুব কষ্ট পেতাম। আমার চেয়েও কম খরচে থাকে এমন অনেক ছাত্রের কথা আমি জানতাম। ভাবলাম দুটো কামরা ছেড়ে দিয়ে একটা কামরাই রাখব এবং রান্নার আধাআধি নিজের হাতেই করব। এতে মাসে ৪।৫ পাউণ্ড বাঁচবে। সরল জীবন সম্পর্কে বই পড়তে লাগলাম। দু কামরা ছেড়ে কম ভাড়ায় একটা কামরাই নিলাম এবং একটা ষ্টোভ্ কিনলাম। সকালের খাবার নিজের হাতেই তৈরী করতে লাগলাম। তাতে ২০ মিনিটের বেশী সময় দিতাম না। দুপুরে বাইরে কোথাও খেয়ে নিতাম, আর সন্ধ্যায় কোকো তৈরি করে রুটির সঙ্গে খেতাম। এতে রোজ এক বা সওয়া শিলিং-এ (প্রায় ১ টাকায়) খাওয়ার খরচ চালাতাম। ঐ সময় আমাকে খুব বেশী পড়তে হত। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।

পাঠক যেন না ভাবেন, এইভাবে খরচ কমাবার জন্যে আমার জীবন নীরস হয়ে গেল। বরং এই পরিবর্তনে আমার অন্তর ও বাইরে ঐক্য স্থাপিত হল, পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো গেল এবং জীবন আরো সমৃদ্ধি লাভ করল। আত্মিক আনন্দের সীমা রইল না।

## প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা

জীবন সম্পর্কে যতই গভীরভাবে বিচার করতে লাগলাম, ততই

আমার ভেতরে ও বাইরে পরিবর্তন আনার আবশ্যকতা বোধ করলাম। আচার-ব্যবহার ও খরচ সম্পর্কে যত রদবদল হতে লাগল, খাওয়া সম্পর্কেও ততটা বা তার চেয়েও বেশী ফেরফার করতে সুরু করলাম।

বিলেতে নিরামিষাহারী-অনুরাগীদের এক সংস্থা ছিল। তাঁদের একটা সাপ্তাহিক পত্রও বেরুত। আমি তার গ্রাহক ও সংস্থার সদস্য হলাম। ওখানে নিরামিষ-ভক্ত অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হল। ভোজন সম্পর্কে আমার পরীক্ষা সুরু হল। বাড়ি থেকে মসলা মিঠাই আনা বন্ধ করে দিলাম। মসলা-চা-কফি ছেড়ে দিলাম। প্রধানত রুটি, কোকো ও সিদ্ধ তরকারির উপর দিন কাটাতে লাগলাম। এই সব পরীক্ষা থেকে বুঝতে পারলাম স্বাদের মূল জায়গা জিভ নয়—মন।

আমি বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞান সঞ্চয় করতে চেষ্টা করলাম। থিওজফিস্ট বন্ধুরা সংস্কৃতে মূল গীতা পাঠ করতে উৎসাহ দিলেন, আমি ভাল সংস্কৃত জানতাম না, তাই সংকুচিত ভাবে তাঁদের সঙ্গে পড়তে রাজী হলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'বিষয়ান্ ধ্যায়তো পুংসঃ' ইত্যাদি শ্লোকগুলি আমার খুবই ভাল লাগল। বুঝলাম, ভগবদ্গীতা অমূল্য গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্যে গীতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে করি। নৈরাশ্যের সময় এই গ্রন্থ আমাকে অসীম সাহায্য দিয়েছে।

এই সময় এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের প্রেরণায় বাইবেল পড়তে সুরু করি। বাইবেলের 'গিরি প্রবচন' (Sermon on the Mount)

আমার মনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করল। 'যে জামা চায়, তাকে আঙরাখা দাও ; যে ডান গালে চড় দেয়, তার দিকে বাম গাল ফিরিয়ে দাও'—এ সব পড়ে আমার অপার আনন্দ হল।

১৮৯০ সাল আমার বিলেতে থাকার শেষ বৎসর। পোর্টস্-মাথে নিরামিষাশীদের এক সভা হয়। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে আমি যাই। সেখানে এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে আমাদের রাখা হয়। অভ্যর্থনা সমিতি সে সম্পর্কে কিছু জানতেন না। সেখানে বিলেতী প্রথা অনুসারে মেয়েদের সঙ্গে তাস খেলতে বসি। সাধারণত তাস খেলায় দোষের কিছু থাকে না ; কিন্তু ওখানে অশ্লীল কথাবার্তা সুরু হল। আমি জানতাম না যে, আমার বন্ধু এ বিষয়ে ওস্তাদ ছিলেন,—ক্রমে আমিও ওতে মজা পেতে লাগলাম। ফুরতি যখন কথা থেকে কাজে পরিণত হতে যাচ্ছিল, তখন আমার বন্ধুর কণ্ঠে ভগবান আবির্ভূত হয়ে বললেন,—'এই পাপ করবে তুমি ! এ তোমার কাজ নয়। পালাও এখান থেকে।' আমার হুঁশ হল, লজ্জিত হলাম, বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। মার নিকট প্রতিজ্ঞা মনে হল, ওখান থেকে সরে পড়লাম, কাঁপতে কাঁপতে নিজের কুঠরিতে পৌঁছলাম।

অনুভব করলাম, ঈশ্বর আমাকে বাঁচালেন। জীবনে আরো অনেক সংকটে ঈশ্বর এইভাবে আমাকে বাঁচিয়েছেন। যখন চারদিকে নিরাশার অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে, তখন অকস্মাৎ কোত্থেকে সাহায্য এসে যায়। স্তুতি, উপাসনা, প্রার্থনা, এ সব অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং এসব খাওয়াপরা,

চলাবসা ইত্যাদির মতই বা তার চেয়ে বেশী সত্য। এমন কি, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ওটাই একমাত্র সত্য, অন্য সব বিষয় অসত্য—মিথ্যা।

## ব্যারিস্টার

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন আমি ব্যারিস্টারি পাস করলাম ও ১২ই জুন ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পাস ত করলাম, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম, আমার বাইরের জ্ঞান ব্যারিস্টারি চালাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়নি।

জুন-জুলাইয়ে ভারত মহাসাগরে তুফান থাকে। এডেন থেকে সকলে সমুদ্র পীড়ায় ভুগছিলেন, একা আমি আরামে ছিলাম, তুফান দেখতে মাঝে মাঝে ডেকে যেতাম ও ভিজতাম, বাইরের ঐ তুফানে আমি যেমন শান্ত ছিলাম, অন্তরের তুফান সম্পর্কেও সেই কথা। যখন বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছলাম, তখন বড়দা উপস্থিত ছিলেন। মার স্বর্গপ্রাপ্তি সম্পর্কে আমি আগে কোন খবর পাই নি, বাড়ি গিয়ে সেই খবর পেলাম ও স্নান করলাম। বিলেতেই এই খবর পাঠান যেত, কিন্তু আমার খুব আঘাত লাগবে মনে করে বড়দা বোম্বাই পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর চেয়ে মায়ের মৃত্যুতে বেশী আঘাত পেলাম। আমার কত সাধের কল্পনা মাটিতে মিশে

গেল। তবু আমি কাঁদিনি। এভাবে কাজ করে গেলাম—যেন মার মৃত্যু হয়নি।

কিছুদিন রাজকোটে থেকে বন্ধুদের পরামর্শমত কাজকর্ম দেখবার, শিখবার ও করবার জন্যে বোম্বাই গেলাম ; কিন্তু সেখানে ৪।৫ মাসের বেশী থাকতে পারলাম না। কারণ, খরচ বেড়ে যাচ্ছিল, অথচ আয় কিছুই ছিল না। এজন্যে হতাশ হয়ে বোম্বাই থেকে রাজকোটে ফিরলাম। একটা অফিস খুললাম। কিছু কিছু কাজ জুটল, মাসে প্রায় ৩০০ টাকা আয় হতে লাগল। বড়দার বন্ধু এক উকীলের গরীব মক্কেলদের কিছু কিছু আর্জি করবার ভার আমি পেতাম। তাতেই আয় করা সম্ভব হত, আমার নিজের কোন যোগ্যতা ছিল না।

## দক্ষিণ আফ্রিকায়

ইতিমধ্যে কাঠিয়াবাড়ের আভ্যন্তরীণ ঝগড়াঝাঁটি দেখে শুনে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় পোরবন্দরের দাদা আবদুল্লা এণ্ড কোম্পানির দোকান থেকে দাদার কাছে এইরকম একটি খবর এলো—"দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার বড় কারবার আছে। তৈয়ব হাজি খান মহম্মদের বিরুদ্ধে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ( প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ) দাবী করে আমি দীর্ঘকাল এক মোকদ্দমা চালাচ্ছি। আপনি যদি আপনার ভাইকে ওখানে পাঠান ত আমাদের কাজের সুবিধা হবে, তাঁরও কিছু সুবিধা হয়ে যাবে।" এই কোম্পানির

এক অংশীদার শর্ত দিলেন যে, যদি আমি এক বছর কাজ করে দি, তাহলে আসা-যাওয়ার জন্যে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ও খাওয়া-খরচ ছাড়া আমি মাসিক ১০৫ পাউণ্ড পাব।

আমি রাজী হয়ে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হলাম। নাটালের ডারবান বন্দরে পৌঁছলাম। আমাকে বন্দর থেকে নিয়ে যাবার জন্যে স্বয়ং শেঠ আবদুল্লা এসেছিলেন। যে সব ভারতীয় বন্ধুবান্ধব অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন, তাঁদের হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যে, এদেশে ভারতীয়দের আদর নেই। আমার দিকে যাদের নজর পড়ছিল, তারাই আশ্চর্য হয়ে দেখছিল; কারণ, আমার বেশভূষা অন্য ভারতীয়ের মত ছিল না।

আবদুল্লা শেঠের বাড়ি গেলাম। তাঁর কামরার পাশের কামরাই আমার জন্যে নির্দিষ্ট হল। শেঠ আবদুল্লা তাঁর ভাইয়ের চিঠি পড়লেন। তিনি যেন একটু মুস্কিলে পড়ে গেলেন, ভাবলেন, ভাই একটি সাদা হাতী পুষবার ব্যবস্থা করেছে। আমার সাহেবী ধরন-ধারণ তাঁর পক্ষে খুব ব্যয়বহুল মনে হল। আমার দ্বারা কতটা কি কাজ পাওয়া যাবে—আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হব কি না, মোকদ্দমার কাজ আমার হাতে সঁপে দিতে না পারলে শুধু শুধু বসিয়ে বসিয়ে আমাকে খাওয়াতে হবে, এ সব ভাবতে লাগলেন।

শেঠ আবদুল্লা লেখাপড়া বেশী জানতেন না, কিন্তু বুদ্ধির জোরে সব কাজকর্ম চালিয়ে নিতেন। কারবার চালাবার মত ইংরেজী

তিনি বলতে পারতেন। তাঁর দোকান ভারতীয়দের দোকানগুলির মধ্যে খুব বড় ছিল। ভারতীয়রা তাঁকে খুব সম্মান করত।

দুয়েক দিন পরে আবদুল্লা আমাকে ডারবানের আদালতে নিয়ে গেলেন ও উকীল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ আমার দিকে তাকিয়ে পাগড়ি খুলতে বললেন, আমি রাজী হলাম না, আদালতের বাইরে চলে গেলাম। শেঠ আবদুল্লা বললেন,—"এখানকার রেওয়াজ এই যে, মুসলমানরা মুসলমানী পোশাক পরে আদালতে ঢুকলে মাথায় মুসলমানী পাগড়ি রাখতে পারে, কিন্তু অন্য সব ভারতীয়কে পাগড়ি খুলে রাখতে হয়।"

এখন উভয়সংকটে পড়লাম, পাগড়ি না নিয়ে আদালতে যাওয়া যাবে না, আবার আদালতে গিয়ে পাগড়ি খোলাও অপমানজনক। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, হিন্দুস্থানী পাগড়ির বদলে সাহেবী টুপী পরব; কিন্তু শেঠ আবদুল্লা বললেন,—"এতে যেসব ভারতীয় হিন্দুস্থানী পাগড়ি পরে, তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে, আর আপনার মাথায় দেশী পাগড়িই ভাল দেখায়।" এ কথা আমার খুব ভাল লাগল। আমি দেশী পাগড়ির পক্ষ সমর্থন করে খবরের কাগজে লেখা পাঠালাম। খবরের কাগজে এই নিয়ে খুব তোলপাড় হল। তিন-চার দিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার নাম রটে গেল। কেউ আমায় সমর্থন করলেন, কেউ বা নিন্দা করলেন।

সাত-আট দিনের মধ্যে আমি মোকদ্দমার কাজকর্মের জন্যে প্রিটোরিয়া রওনা হলাম। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেনা হয়েছিল। শোবার জন্যে ৫ শিলিং দিলে আলাদা টিকিট পাওয়া যেত। শেঠজী

আমাকে ঐ টিকিট নিতে জেদ করলেন, কিন্তু আমি নেওয়া ভাল মনে করলাম না। শেঠজী আমাকে সাবধান করে বলে দিলেন, —"দেখ এ অন্য দেশ, ভারতবর্ষ নয়। পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করো না। আরামের সব ব্যবস্থা করে নাও।" আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।"

রাত্রি প্রায় নটায় নাটালের রাজধানী মরিৎস্‌বার্গে পৌঁছলাম, গাড়ির কর্মচারীরা এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার বিছানার দরকার আছে কি-না, আমি বললাম—"না"। ইতিমধ্যে একজন যাত্রী ঐ কামরায় ঢুকে আমাকে হিন্দুস্থানী দেখে চমকে নেমে গেল; একটু পরে একজন কর্মচারী এসে আমাকে ঐ গাড়ি থেকে নেমে অন্য গাড়িতে যেতে বলল। আমি বললাম, "আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে, ডারবান থেকে এই গাড়িতেই আমাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে—এই গাড়িতেই যাব।" তখন একজন সিপাইকে ডেকে এনে আমাকে জোর করে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দেওয়া হল। আমি আর গাড়িতে উঠলাম না। ট্রেন চ'লে গেল। হ্যাণ্ড্‌ব্যাগটা নিয়ে সরাইখানায় গেলাম—বিছানাপত্র প্ল্যাটফর্মেই প'ড়ে রইল, তাতে হাত দিলাম না।

মরিৎস্‌বার্গে তখন ভয়ানক শীত। মুসাফিরখানায় বসে বসে কাঁপতে লাগলাম, ওভারকোট বিছানার মধ্যেই ছিল। রেল-কোম্পানি বিছানা নিয়ে কোথায় রেখে দিয়েছিল—তাদের কাছে চাইতে সাহস হল না, পাছে আবার অপমান করে। সকালে রেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ও আবদুল্লা শেঠের কাছে সব

কথা বর্ণনা করে লম্বা তার পাঠালাম। শেঠজী জেনারেল ম্যানেজারকে ধরে আমার অন্য গাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং মরিৎস্‌বার্গ ও অন্যান্য স্থানের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে তার করলেন। তাঁরা আমার সংগে দেখা করে ভারতীয়দের দুর্দশার কথা জানালেন।

আমি বুঝলাম—এ হল বর্ণ-বিদ্বেষের ফল, সাদা চামড়া ও কালো চামড়ার ঝগড়া। স্থির করলাম, আমাকে এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়তে হবে—যতদিন না এই বর্ণ-বৈষম্য দূর হয়।

সারাদিন ব্যবসায়ীদের সংগে কথাবার্তা হল। রাত্রি হল, গাড়ি এল, আমার জন্য জায়গা তৈরী ছিল। এবারে শোওয়ার টিকিট কিনলাম। গাড়ি চার্লস্‌টাউনে পৌঁছল। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে জোহান্সবার্গে গেলাম। ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়ার সময় আমাকে আরো দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল।

জোহান্সবার্গ* থেকে রেলে প্রিটোরিয়ায় গেলাম।

## সেবার কার্যে হাতেখড়ি

১৮৯৪ সালের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। মোকদ্দমার কাজ করবার সময় ওদিকে বেশী কিছু করা সম্ভব ছিল না, দুই কাজ একসঙ্গে করতে গেলে কোনটাই ভাল হত না।

* মূল আত্মকাহিনীতে সবিস্তারে বর্ণনা আছে।

মোকদ্দমার কাজ সন্তোষজনক ভাবেই শেষ হয়ে গেল। তাই ডারবানে ফিরলাম ও সেখান থেকে ভারতবর্ষে ফেরবার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম। দাদা আবদুল্লার বাড়ীতে যখন আমি সবার কাছে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন একজন 'নাটাল মার্কারি' নামে সংবাদপত্রের একটি সংখ্যা আমাকে দেখাল। তাতে নাটালের ব্যবস্থাপক সভার এক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ছিল। তার মধ্যে কয়েকটি ছত্রে ভারতীয়দের ভোটাধিকার হরণ করবার জন্যে একটি বিল পেশ করবার সংবাদ ছিল। একে ভারতীয়দের অধিকার ছিল খুব কম, যা ছিল আবার তাও কেড়ে নেওয়া সুরু হল! এই দেখে আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া স্থগিত রাখলাম। সেই রাত্রেই বসে আমি ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবার জন্যে একটা দরখাস্তের খসড়া করলাম। শেঠ আবদুল্লার সভাপতিত্বে একটি কমিটি তাড়াতাড়ি তৈরি ক'রে গভর্ণমেণ্টের কাছে তার ক'রে জানালাম, যেন ব্যবস্থাপক সভার কাজ সত্বর আরম্ভ করা না হয়। ফলে ২ দিনের জন্যে বিল পেশ করা স্থগিত রইল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক সভায় আর্জি পাঠানো এই প্রথম। এতে বিল পাস করা বন্ধ হল না, অবশ্য অন্য কাজ কিছু হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলন এই প্রথম। চারিদিকে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল। প্রত্যহ সভাসমিতি হতে লাগল, টাকা-পয়সাও অনেক জুটল, অনেকে স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কাজ করবার জন্যে তৈরী হয়ে গেল। অনেকে নিজেরা

খাটত, পয়সাও দিত। হাজার হাজার লোকের স্বাক্ষর নেওয়া চলল। এক মাসের মধ্যে দশ হাজার লোকের এক দরখাস্ত উপনিবেশ-মন্ত্রী লর্ড রিপনের কাছে পাঠান হল। এইভাবে আমার সে সময়ের কাজ শেষ হল। আবার ভারতবর্ষে ফেরবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু ভারতীয়েরা রাজী হলেন না, তাঁরা বললেন, "আপনিই বলেছেন ভারতীয়দমন সবে সুরু হয়েছে। উপনিবেশ-মন্ত্রী কি করবেন জানি না, এতে কাজ না হলে অন্য কিছু করতে হবে। আপনাকে থাকতেই হবে, আপনি না থাকলে আমাদের রাস্তা দেখাবে কে?" তাঁদের আগ্রহ দেখে আমার ভাল লাগল। ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্যে একটি স্থায়ী সমিতি তৈরী করা কর্তব্য মনে করলাম। এজন্যে আবার আমি থেকে গেলাম। এইভাবে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের কাছাকাছি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম হল। সেই সঙ্গে আমার দক্ষিণ আফ্রিকাবাসের ভিত্তি স্থাপিত হল ও ভারতীয়দের আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই সুরু হল।

যাঁরা এই লড়াইয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান তাঁরা যেন 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' বইটি পড়েন। তা হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমরা কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, সরকার-পক্ষ কংগ্রেসকে কত অসুবিধায় ফেলেছিলেন, কংগ্রেস কিভাবে আত্মরক্ষা করেছিল ইত্যাদি। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, কংগ্রেস সর্বদা ভারতীয়দিগকে অত্যুক্তির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করে দিত, ইউরোপীয়দের

যুক্তি-তর্কের মধ্যে যদি কোন কথা ন্যায্য মনে হত, তাহলে তার সম্মান করত, তাদের সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে সহযোগিতা করবার অবসর উপস্থিত হলে আন্তরিক ভাবে তা করা হত। আন্দোলনের সমস্ত খবর সংবাদপত্রে পাঠান হত এবং যখনই সংবাদপত্রে ভারতীয়দের সম্পর্কে কোন আক্রমণ করা হত, তখন তার জবাবও দেওয়া হত।

## ঝড়ের আভাস

১৮৯৬ সাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন বছর কেটে গেল। উকিল হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নানা কারণে লোকে আমার এখানে থাকা আবশ্যক মনে করছে, কাজেই পরিবারবর্গকে আনবার জন্যে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেলাম। ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তার পেলাম। দাদা আবদুল্লা শেঠ ঐ সময় 'কুরল্যাণ্ড' নামে একটা স্টীমার কিনেছিলেন। তিনি ব'লে পাঠালেন, আমি যেন সেই স্টীমারে বিনা ভাড়ায় সপরিবারে যাত্রা করি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে রাজী হলাম এবং ডিসেম্বরের প্রথমে বোম্বাইয়ে জাহাজে চড়লাম। এবারে আমার সঙ্গে স্ত্রী ও দুই ছেলে ছিল। আমাদের সঙ্গে 'নাদরী' নামে আর একটি জাহাজও ছিল, দুই জাহাজের মোট যাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় আট শত, তার মধ্যে অর্ধেক লোক ট্রান্সভালে যাচ্ছিল।

সমুদ্রে ৩।৪ দিন খুব ঝড়ঝাপটা হল। সে যেন ছিল আমাদের ভাবী ঝটিকার পূর্বাভাষ। ঝড়ের বেগ এত বেশী ছিল ও এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে, যাত্রীরা ঘাবড়ে গেল। দুঃখের সময় হিন্দু মুসলমান সব এক হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল। কাপ্তেন যাত্রীদের আশ্বাস দিতে লাগলেন। কিন্তু তাদের ভয় গেল না। জাহাজে এমন বিকট শব্দ হতে লাগল যেন জাহাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জাহাজ এত দুলতে লাগল যেন এখনই উল্টে ডুবে যাবে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ছিল অসম্ভব।

অবশেষে ঝড় কাটল, আকাশ পরিষ্কার হল, সকলের মন থেকে চিন্তা দূরে গেল, সেই সঙ্গে ঈশ্বরও বিদায় নিলেন। মৃত্যুভয় দূর হতেই আবার গান-বাজনা খানাপিনা স্থুরু হয়ে গেল। মায়ার পর্দা আবার সব কিছু ঢেকে দিল। এরপরও নমাজ, ভজন, সব হতে লাগল, কিন্তু ঝড়ের সময় যে আন্তরিকতা ছিল, তার কিছুই আর রইল না।

ঝড়ের কল্যাণে যাত্রীদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। জাহাজে আমার বমি-টমি হত না। এমন ঝড়ে আগেও পড়েছি। কাজেই নিজে নিশ্চিন্ত থেকে যাত্রীদের শুশ্রূষা করবার স্থবিধা আমার হয়েছিল।

১৮ই বা ১৯শে ডিসেম্বর আমাদের জাহাজ ডারবানে এসে নোঙ্গর করল। 'নাদরী' জাহাজও সেইদিন এসে পৌঁছল। কিন্তু প্রকৃত ঝড়ের অনুভূতি তখনও ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে।

## কষ্টিপাথর

বোম্বাই থেকে যখন আমাদের জাহাজ ছাড়ে, তখন সেখানে প্লেগ দেখা দিয়েছিল, সেজন্য জাহাজ বন্দরে পৌঁছতেই ডাক্তার এসে হুকুম দিলেন পাঁচদিন যাত্রীরা কেউ উপরে উঠতে পারবে না। প্লেগের জীবাণু নাকি ২৩ দিন বেঁচে থাকে। সমুদ্রে ১৮ দিন কেটেছে, কাজেই আর ৫ দিন স্বতন্ত্র থাকার কথা ; কিন্তু উপরে অন্য প্রকারের আন্দোলন চলছিল। ডারবানের গোরারা আমাদের একেবারেই নামতে দেবে না স্থির করেছিল। তারা বড় বড় সভা করে আমাদের বিরুদ্ধে দল ভারী করছিল, দাদা আবদুল্লাকে কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে জাহাজ ফেরৎ পাঠাতে বলছিল। কিন্তু তিনি সহজে দমে যাবার পাত্র ছিলেন না, অন্য অনেক প্রভাবশালী বন্ধুও উপর থেকে খবর পাঠাচ্ছিলেন যেন আমরা কিছুতে ফিরে না যাই।

গোরাদের এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিলাম আমি। আমার উপর দুটি অভিযোগ ছিল, এক—ভারতবর্ষে আমি গোরাদের অযথা নিন্দা করেছি ; দুই—আমি ভারতবাসীর দ্বারা নাটাল ছেয়ে দিতে চাচ্ছি ; তাই দুটো জাহাজ ভর্তি করে লোক এনেছি।

আমি অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করলাম। আমার জন্যে দাদা আবদুল্লা খুব বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন—যাত্রীরা আমার জন্যে গুরুতর অবস্থায় পড়েছে, আমার স্ত্রীপুত্রও আমার জন্যে মহাসংকটে পড়ল,

তবু আমি জানতাম আমি নির্দোষ। কাউকে আমি নাটালে ডেকে আনিনি।

অবশেষে ১৩ই জানুয়ারি উপরে উঠবার হুকুম পাওয়া গেল। অন্য যাত্রীরা নেমে গেল, কিন্তু আমার সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এক সদস্য মিঃ এস্কম্ব্ কাপ্তেনের কাছে বলে পাঠিয়েছিলেন —আমি যেন স্ত্রীপুত্র সহ সন্ধ্যায় নামি, কারণ গোরারা আমার উপর খুব চটে আছে, আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, রাত্রে গেলে নিরাপদে যেতে পারব।

কাপ্তেনের কথামত আমি সন্ধ্যায় নামাই স্থির করলাম, কিন্তু একটু পরে আমার বন্ধু মিঃ লাটন এসে কাপ্তেনকে বললেন, "মিঃ গান্ধী যদি আমার সঙ্গে আসতে চান ত আমি নিজের দায়িত্বে নিয়ে যেতে পারি।" পরে আমার কাছে বললেন, "আপনার যদি জীবনের আশঙ্কা না থাকে, তবে শ্রীমতী ও ছেলেদের গাড়ীতে করে রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন এবং আমি ও আপনি পায়ে হেঁটে সদর রাস্তায় যাই আসুন। রাতের অন্ধকারে চোরের মত যাওয়া আমার মোটেই ভালো মনে হয় না। এখন ত চারিদিক নিস্তব্ধ, গোরারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে গেছে, আমার মতে আপনার ওভাবে লুকিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।" আমি রাজী হয়ে গেলাম, স্ত্রী ও ছেলেরা গাড়ীতে চড়ে রুস্তমজীর বাড়ীতে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছল —আমি কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে—মিঃ লাটনের সঙ্গে জাহাজ থেকে নামলাম ; রুস্তমজীর বাড়ী জাহাজঘাট থেকে প্রায় ২ মাইল দূরে ছিল।

রাস্তায় যেতেই কয়েকটি গোরা ছোকরা আমাকে দেখে 'গান্ধী' 'গান্ধী' বলে চেঁচাতে লাগল। ক্রমে ভীড় জমে গেল। মিঃ লাটন আমাকে একটা রিক্সায় চড়তে বললেন। আমার রিক্সা চড়া পছন্দ হত না। ছোকরারা চড়তেও দিল না, তারা রিক্সাওয়ালাকে ধাক্কা মেরে ভাগিয়ে দিল। আমরা এগিয়ে চললাম, ভীড় আরো বাড়তে লাগল। মিঃ লাটন আমাকে ভীড় থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যেতে লাগলেন। গোরারা আমার উপর ঢিল, পচা ডিম ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতে লাগল, ক্রমে লাথি সুরু হল, একজন আমার পাগড়ি উড়িয়ে দিল, আমার মাথা ঘুরতে লাগল, কাছের দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলাম, দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। থাপ্পড় ঘুষি চলতে সুরু করেছে। এমন সময় আমার পূর্বপরিচিত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী ঐ রাস্তায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং রোদ না থাকলেও আমার উপর তাঁর ছাতা তুলে ধরলেন। এতে ভীড় একটু কমল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভারতীয় আমার অবস্থা দেখে থানায় দৌড়ে গেলেন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজাণ্ডার আমাকে বাঁচাবার জন্যে একজল সিপাই পাঠিয়ে দিলে। তারা যথাসময়ে এসে পৌঁছল। তাদের সঙ্গে থানায় গেলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে আপাতত থানায় থাকতে বললেন, আমি রাজী না হয়ে বললাম— "লোকের ন্যায়বুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস আছে। তারা নিজেদের ভুল বুঝলেই রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" আমাকে পুলিশের রক্ষণাধীনে রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল।

পিঠে খুব চোট লেগেছিল, এক জায়গায় জখমও হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

এইভাবে যখন আমরা ভেতরে শান্তিতে ছিলাম, সেই সময় গোরারা বাড়ির চারধার ঘিরে ফেলল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। বাইরে হাজার হাজার লোকের চীৎকার—"গান্ধীকে আমাদের হাতে দাও!"

গতিক ভাল নয় দেখে সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট আলেকজাণ্ডার নিজে সেখানে এসে গিয়েছিলেন। তিনি ভয় না দেখিয়ে হাসিঠাট্টা করে জনতাকে অন্যমনস্ক রাখছিলেন। এদিকে তিনি আমার কাছে খবর পাঠালেন, "যদি আপনি আপনার বন্ধুর জীবন ও সম্পত্তি এবং নিজের স্ত্রীপুত্রের জীবন বাঁচাতে চান, তাহ'লে আমি যেমন বলি, আপনাকে সেইভাবে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরামর্শমত আমি হিন্দুস্থানী সেপাইর পোশাক পরলাম, মাথার পাগড়ির নিচে পেতলের রেকাব পরলাম—যাতে চোট সহ্য করা যায়। দুজন ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে পাশের গলি দিয়ে একটি দোকানের পেছন দিকে ঢুকলাম। সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, গলির মুখে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেই গাড়িতে চড়ে থানায় গিয়ে পৌঁছলাম।

এবারে বেঁচে যাওয়ার জন্যে আমি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ও গোয়েন্দা পুলিশের কর্মচারীদের নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।

আমি যখন সরে পড়ছিলাম তখন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সাহেব গোরাদের গান শোনাচ্ছিলেন—"গান্ধীকে আজ তেঁতুল গাছে

টাঙ্গিয়ে দেব ফাঁসি"—যখন নিশ্চিতভাবে খবর পেলেন যে আমি নিরাপদ স্থানে পৌঁছেচি, তখন গোরাদের বললেন, "দেখ, তোমাদের গান্ধী ত ঐ দোকান থেকে বেরিয়ে তোমাদের ভেতর দিয়েই চলে গেল। বিশ্বাস না হয় ভেতরে গিয়ে দেখ।" তারা শুনে খুব নিরাশ হল, দুএকজন প্রতিনিধি ভেতরে গিয়ে দেখল। অবশেষে তারা কেউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডারের চতুরতার প্রশংসা করতে করতে, কেউ বা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। পরে উপনিবেশ সচিব মিঃ চেম্বারলেন খবর পাঠালেন, যেন আমাকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার ও ন্যায়বিচার পাবার সুযোগ দেওয়া হয়। মিঃ এস্‌কম্ব্‌ এজন্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন ও মিঃ চেম্বারলেনের ও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের অভিপ্রায় জানিয়ে বললেন যে, আমি ইচ্ছা করলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারি। আমি তাতে অসম্মত হলাম। বললাম, "বেচারীরা ভুল খবর শুনে উত্তেজিত হয়েছিল। ভেবেছিল আমি ভারতবর্ষে গিয়ে তাদের বদনাম করেছি। কাজেই উত্তেজিত হয়ে এই অন্যায় কাজ করেছে। এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। ওদের বিশেষ কোন দোষ নেই। ওদের ভুল খবর শোনার জন্যে বরং আপনারাই দায়ী।"

আমি মোকদ্দমা চালাব না জেনে মিঃ এস্‌কম্ব্‌ খুশি হলেন। তাঁর ইচ্ছামত আমি ঐ মর্মে একটি বিবৃতি লিখে দিলাম।

নাটালে পৌঁছবার পরমুহূর্তেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের হাতে ভারতবর্ষে প্রদত্ত

আমার লিখিত বক্তৃতার প্রতিলিপি দিই। স্যার ফিরোজশাহ্ মেটার পরামর্শ অনুসারে আমি সর্বত্রই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিলাম। এইগুলি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, গোরাদের নিন্দা করার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জাহাজ দুটিতে যেসব ভারতীয় আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা যে অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন বাসিন্দা এবং বাকী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ট্রান্সভালের যাত্রী ছিলেন—নাটালের নয়, এ সব কথাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

এই সব ঘটনার পর এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা না আনার ফলে গোরাদের মধ্যে আমার, তথা ভারতীয়দের, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়। এতে ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহ করবার পথও খুব সুগম হয়।

৩।৪ দিনের মধ্যে বাড়ি গেলাম এবং সত্বর নিজের কাজকর্মে মন দিলাম।

## সেবাভাব ও সরলতা

আমার কাজকর্ম ভালই চলছিল। কিন্তু মনে সন্তোষ ছিল না। কোন-না-কোন শারীরিক সেবাকার্যে নিজেকে আরও লিপ্ত করবার এবং জীবনকে আরো সরল করবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা হত।

একদিন এক অক্ষম কুষ্ঠরোগী এসে পড়ল, তাকে একটা ঘরে রেখে শুশ্রূষা করলাম, তার ঘা ধুইয়ে দিলাম। কিন্তু এরকম রোগীকে বেশীদিন রাখা সম্ভব ছিল না, তাই সরকারী হাসপাতালে পাঠিয়ে

দিলাম। এতেও তৃপ্তি হল না, ভাবতে লাগলাম—যদি সর্বদা এইভাবের সেবাকাজ মেলে ত ভাল হয়।

সেণ্ট এডন্‌স্ মিশনের কর্তৃপক্ষ ডাঃ বুথ খুব হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। তিনি বিনা পয়সায় রোগীদের ওষুধ দিতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পার্শী রুস্তমজীর দানে একটি ছোট হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। সেখানে শুশ্রূষাকারীর কাজ করবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। আমি নিজের সময় থেকে ঘণ্টা দুই বাঁচিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এ কাজ করতে লাগলাম। ওকালতি-সংক্রান্ত কাজের তাতে কোন ক্ষতি হয়নি।

এই কাজে মনে শান্তি পেলাম। রোজ সকালে হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের অবস্থা ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলা ও ডাক্তারের ব্যবস্থা-মত ঔষধ তৈরী করে রোগীদের দেওয়া, এই ছিল আমার কাজ। এই কাজের দ্বারা দুঃখী ভারতবাসীদের সংস্পর্শে আসবার পথ পেলাম। এদের মধ্যে প্রধানত তামিল, তেলেগু ও উত্তর-ভারতীয় গিরমিটিয়ারা ছিল। চুক্তিবদ্ধ কুলিদিগকে 'গিরমিটিয়া' বলা হত। এই সেবাকাজ পরে বুয়োর যুদ্ধের সময় আমার খুব কাজে লেগেছিল। এতে একদিকে যেমন ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হল, তেমনি অপরদিকে সরল জীবনযাত্রার পথে আরো অগ্রসর হলাম।

সংসারের খরচপত্র কমিয়ে দিলাম। কাপড়চোপড় ধোলাইতে খুব খরচ হত। প্রায় প্রত্যহ জামা ও কলার বদলাতে হত, রজক নিয়মিতভাবে কাপড় আনত না, সেজন্যে ২।৩ ডজন জামা ও কলারের কমে কাজ চলত না। ঠিক করলাম, নিজেদের হাতে

ধোলাই করব। ধোলাইবিদ্যার বই কিনলাম। নিজে ধোলাই শিখলাম, স্ত্রীকেও শেখালাম। এতে একটু কাজ বাড়ল বটে, কিন্তু নূতন কাজ করবার জন্যে মনে আনন্দও পাওয়া গেল।

প্রথমবার ধোলাই করতে গিয়ে কলার অত্যন্ত বিশ্রী হয়, সেই কলার পরে আদালতে গেলে বন্ধু ব্যারিস্টাররা তাই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। আমি এতে দমবার পাত্র ছিলাম না। বললাম, "এতে আপনাদের ত আনন্দ দিতে পারলাম।" তাছাড়া নিজের হাতে ধুয়ে নেওয়ার সুবিধা কি তা বললাম। কিন্তু তাঁরা তা বুঝলেন না।

আমি শেষ পর্যন্ত কাজ চালাবার মত ধোলাইবিদ্যা শিখেছিলাম।

## একটি পুণ্যস্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত

ডারবানে ও জোহান্সবার্গে আমার সঙ্গে সর্বদা কয়েকজন বন্ধু ও আমার কোন কোন কেরানী থাকতেন। তাঁরা প্রায়ই ছিলেন হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান। তাঁরা হয় গুজরাট, নয় মাদ্রাজের লোক ছিলেন। আমি তাঁদের নিজের আত্মীয়ের মতই দেখতাম। একজন কেরানী ছিলেন খ্রীষ্টান, তার মা-বাপ ছিলেন অস্পৃশ্যজাতীয়। তখন রাত্রিতে ঘরের ভেতর পেচ্ছাব করবার জন্যে একটি পাত্র রাখা হত। আমি ও কস্তুরবা দুজনে মিলে সেগুলি সাফ করতাম। অবশ্য যাঁরা একেবারে ঘরের লোকের মত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাই পাত্রগুলি সাফ করতেন। কিন্তু এই অস্পৃশ্য শ্রেণীর নূতন কেরানীটির পাত্র আমাদেরই সাফ করতে হত। কস্তুরবা সাফ করতেন, কিন্তু

এ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য। তাই সাফ করবার সময় নীরবে চোখের জল ফেলতেন। আমার এ দৃশ্য ভাল লাগল না। একদিন ধমক দিয়ে বললাম, "ওসব এখানে চলবে না। যদি করতে হয় ত হাসিমুখে কর।" এই কথাগুলি তীরের মত কস্তুরবাকে বিদ্ধ করল। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"তবে তোমার ঘর তুমি সামলাও, আমি চললাম।" আমি তখন ঈশ্বরকে ভুলে গেছলাম। নির্দয়ভাবে তাঁর হাত ধরে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলাম। কস্তুরবার চোখে গঙ্গাযমুনার ধারা বইছিল, তিনি বললেন—"তোমার কি লজ্জা-সরম নেই? লোকে বলবে কি? আমি কোথায় যাব? মা বাপ নেই যে তাদের কাছে যাই, আমি স্ত্রীলোক বলেই তোমার যত অত্যাচার সহ্য করতে হবে? এখন দয়া করে দরজাটা বন্ধ কর।" আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এইভাবে আমাদের মধ্যে অনেক বার ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, কিন্তু তার ফল কখনও খারাপ হয়নি। কস্তুরবা তাঁর নিজের অদ্ভুত সহনশক্তি দ্বারা সর্বদা জয়লাভ করতেন।

তখন আমি ছিলাম একদিকে মোহান্ধ, অন্যদিকে নিজেকে তাঁর শিক্ষক বলে মনে করতাম। শেষজীবনে আমরা পরস্পরের প্রতি নির্বিকার থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে জীবন কাটিয়েছি। কস্তুরবা শেষে একেবারে নিঃস্বার্থ সেবিকা হয়ে গিয়েছিলেন। আমার অনুসরণ করাই তিনি পুণ্য মনে করতেন এবং আদর্শ-জীবনযাপনে তিনি কখনো আমাকে বাধা দেন নি। আমাদের বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্য ছিল প্রচুর—তবু আমাদের জীবন ছিল আনন্দময় ও আদর্শাভিমুখী।

## বুয়োর যুদ্ধ

[ ১৮৯৯-১৯০০ ]

ইংরেজদের সঙ্গে বুয়োরদের যে যুদ্ধ বাধে তার বিস্তৃত বিবরণ 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' বইখানিতে দেওয়া আছে। বুয়োরদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তবু তখন আমার চিন্তাধারা ছিল অন্যরূপ। ভাবতাম ব্রিটিশ প্রজাহিসেবে যাদের কাছে অধিকারের দাবি করি, তাদের বিপদে সাহায্য করাও আমার কর্তব্য ; আরও ভাবতাম যে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বথা কল্যাণকর। তাই যোদ্ধা হিসেবে নয়—শুশ্রূষাকারী-হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিলাম, একটি ছোট শুশ্রূষাকারী দল গঠিত হল। ডাঃ বুথ ঘা ধোয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা ও সার্টিফিকেট দিলেন।

এ পর্যন্ত ইংরেজদের ধারণা ছিল ভারতবাসীরা বিপদের মধ্যে যেতে চায় না, স্বার্থ ছাড়া তারা আর কিছুই বোঝে না। যাই হোক, সরকার আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, আমাদের দলে প্রায় এগার শ লোক যোগ দিল। তাদের মধ্যে ৪৪ জন দলপতি ছিল। এই এগার শ লোকের মধ্যে প্রায় তিন শ ছিল স্বাধীন ও বাকী সব গিরমিটিয়া ( চুক্তিবদ্ধ কুলী )। ডাঃ বুথও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই দলটি বেশ ভালভাবেই কাজ করেছিল।

আমরা প্রথমত যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে রেড্ ক্রশ ধারণ করে কাজ করতাম। যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদের মধ্যে আমাদের যেতে দেওয়া হত

না। কিন্তু পরে একটা বড় হারের পর সরকার পক্ষ বললেন, "আপনারা যুদ্ধের সীমানার মধ্যে যেতে বাধ্য নন, তবু যদি তার ভেতর গিয়ে আহতদের বয়ে আনবার ভার নেন ত সরকার আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।" আমরা বিপদের মধ্যে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম, তাই অতঃপর আগ্নেয়াস্ত্রের সীমার মধ্যে গিয়ে কাজ করতে লাগলাম। এই সময় কয়েকবার আমরা আহতদের নিয়ে প্রত্যহ ২০।২৫ মাইল অতিক্রম করেছি।

ছয় সপ্তাহে আমাদের কাজ শেষ হল। এই সামান্য সেবার জন্যে খুব প্রশংসা পাওয়া গেল। এতে ভারতবাসীদের মর্যাদাও বাড়ল।

ঐ সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যখন লেডিস্মিথ নামে একটি জায়গা বুয়োররা ঘিরে রেখেছিল—তখন সেখানে ইংরেজ ছাড়া কিছু ভারতীয়ও ছিল। সেখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ প্রত্যেক অধিবাসীর উপর কিছু-না-কিছু কাজের ভার দিয়েছিলেন। প্রভু সিং নামে একজন ভারতীয় সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়েছিল। বুয়োররা যখন নিকটবর্তী পাহাড় থেকে কামান দাগত, তখন সে একটা গাছে চড়ে ডালপালার মধ্যে লুকিয়ে থেকে কামান দাগার সঙ্কেত সকলকে ঘণ্টা বাজিয়ে শুনিয়ে দিত। ঘণ্টা শুনে সবাই গোলা পড়ার দু-এক মিনিট আগেই সাবধান হয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে যেতো, এতে বহুলোকের প্রাণ বেঁচেছিল। প্রভু সিংহের সাহসিকতার কথা ভারতের তদানীন্তন বড়লাট্ লর্ড কার্জনের কানেও গিয়েছিল এবং তিনি তাকে একটা কাশ্মীরী পোশাক উপহার পাঠিয়েছিলেন।

## স্বদেশ যাত্রা

বুয়োর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা আবশ্যক মনে হল না, কারণ ভারতবর্ষই আমার কর্মক্ষেত্র, পাছে ধনোপার্জনই মুখ্য কাজ হয়ে যায়, এই ভয়ও ছিল। ভারতের বন্ধুরাও দেশে ফেরবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছিলেন।

তাই দেশে ফিরবার জন্যে বন্ধুদের কাছে অনুমতি চাইলাম। তাঁরা কিছুতেই রাজী নন। শেষে তাঁরা এই শর্তে দেশে ফিরতে হুকুম দিলেন যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহলে আমাকে ফিরে আসতে হবে। এই শর্ত অবশ্য খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু আমি ত বন্ধুদের স্নেহের ফাঁদে ধরা পড়েছিলাম।

বিদায় নেবার সময় নাটালের বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দন ও উপহারের বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন। বহু দামী দামী উপহার, সোনারূপো, হীরাজহরতাদি জমে গেল। কস্তুরবার জন্যে এক বন্ধু পঞ্চাশ গিনির একটা হার দিয়েছিলেন। আমি মুস্কিলে পড়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, এ সব উপহার নেবার আমার কি অধিকার আছে? আমি ত অর্থের জন্যে সেবা করিনি। যেদিন সন্ধ্যায় এইসব উপহার হাতে এল—সেদিন রাতটা প্রায় না ঘুমিয়ে নানা চিন্তায় পায়চারি করে কাটালাম। শত শত টাকার উপহার ছেড়ে দেওয়া শক্ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু নেওয়া আরও শক্ত ঠেকছিল। জীবনকে ক্রমশ সরল করে তুলছিলাম, দামী জিনিসপত্র ঘরে রাখতাম না। স্ত্রীপুত্রদেরও এইভাবেই তৈরী করে তুলছিলাম,

সবাইকে সাদাসিধে হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতাম। এখন সোনার ঘড়ি-চেন, সোনার হার, হীরার আংটী, এসব কে পরবে? সিদ্ধান্ত করলাম—এসব আমি কিছুতেই নিতে পারি না। পার্শী রুস্তমজী ইত্যাদি কয়েকজনকে ট্রাস্টি করে তাঁদের হাতে দিয়ে দেব; তার পূর্বে স্ত্রী ও ছেলেদের মত নেওয়া চাই। কস্তুরবার মত নেওয়া শক্ত হবে জানতাম। আগে ছেলেদের কাছে বললাম, তারা সহজেই রাজী হ'ল; তখন তাদের বললাম, "মাকে রাজী করাতে পারবে ত?" তারা বললে, "নিশ্চয়ই। মা ত আমাদের জন্যেই গহনাপত্র নেবেন, তা আমরাই যদি রাজী না হই ত মা আর কার জন্য নেবেন?" কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ব্যাপার এত সহজ নয়। কস্তুরবা নানা তর্ক তুললেন, বললেন—"তোমার কি? নিজে ত বৈরাগী, ছেলেগুলোকেও বৈরাগী করে তুলছ? তোমার আর ছেলেদের দরকার না হোক, আমিও চাই না, কিন্তু বউরা ঘরে এলে তাদের ত দিতে হবে!" এইভাবে বাক্যস্রোত বইতে লাগল, সেই সংগে অশ্রুস্রোত। আমি বললাম, "সেজন্য চিন্তা কি? ছেলেরা বড় না হলে ত বিয়ে দেব না; বউ আনার সময় হলে তখন এমন বউ আনব, যে গয়নার জন্য পাগল হবে না। আর যদি কিছু দিতে হয়, আমি ত বেঁচে থাকব?" কস্তুরবা বললেন, "তুমি সেই লোক না—যে আমারই গয়না খুলে নিয়েছে, সে আবার আমার বউকে গয়না দেবে! আমি এ সব গয়না কিছুতেই দেব না। আমি যে হার পেয়েছি, তাতে তোমার কি?" আমি বললাম, "সেও ত আমারই সেবার ফলে পেয়েছ?" কস্তুরবা চট্ করে বললেন,

"তোমার সেবায় বুঝি আমার সেবা নেই? রাতদিন যে আমাকে কুলিমজুরের মত খাটিয়েছ, সে বুঝি সেবা নয়? আমাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে যার-তার সেবা করিয়ে নিয়েছ, সে বুঝি আমার সেবা নয়?" কস্তুরবার কথাগুলি তীক্ষ্ণ বাণের মত আমাকে বিঁধছিল। কিন্তু গয়না ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইলাম। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কস্তুরবাকে রাজী করালাম। দুবার দেশে যাওয়া উপলক্ষে প্রাপ্ত সমস্ত উপহার ফেরত দেওয়া হল। জনসেবার জন্যে আমার ও ট্রাষ্টিদের অভিপ্রায়মত ব্যয় করা হবে, এই শর্তে ব্যাঙ্কে রাখা হল। কস্তুরবাও পরে এর ঔচিত্য বুঝেছিলেন। এইভাবে জীবনে বহুবার আমি প্রলোভন থেকে বেঁচে গেছি। আমার দৃঢ় অভিমত এই: জনসেবা-কার্যের জন্যে জনসেবক যা উপহার পান, তাতে তাঁর নিজের কোন অধিকার নেই। জনসেবাতেই তা খরচ করা উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে এসে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিই। সৌভাগ্যবশতঃ তখন কিছু কিছু সেবাকার্য করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে আমাকে নিজের ছোট ভাইএর মত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁরই চেষ্টায় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাশ করান সম্ভব হয়েছিল। আমার সকল কাজেই তিনি খুব আগ্রহ দেখাতেন। তাঁর কাছে আমি অনেক শিক্ষা পেয়েছি। তাঁর সমস্ত কাজই দেশ-হিতের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে বোম্বাইতে ওকালতি ও সেই সংগে দেশ-সেবা করতে

পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও নিজের ব্যারিস্টারি করা সম্পর্কে যোগ্যতার অভাব আছে মনে করে প্রথমত রাজকোটে বসলাম। সেখানে কাজ ভালই চলছিল। কিন্তু আমার বন্ধুরা জেদ করে আমাকে বোম্বাইতে পাঠালেন। তাঁরা বললেন, "তোমাকে রাজকোটে কবর দেওয়া চলবে না।"

অগত্যা বোম্বাই গেলাম ও অফিস খুলে বসলাম।

## আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

বোম্বাইতে একটু স্থির হয়ে বসেছি, এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তার এল—"চেম্বারলেন আসছেন, আপনাকে অবিলম্বে আসতে হবে।" পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভুলি নি। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে আবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে দেখলাম, ভারতীয়দের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক শোচনীয় হয়ে গেছে। বুয়োর যুদ্ধের সময় ভারতীয়রা যে সেবাকার্য করেছিল, গভর্নমেণ্ট তা ভুলে গেছে এবং ভারতীয়দের নূতন নূতন অসুবিধায় ফেলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বুঝলাম, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের সেবা ভালভাবে করতে হলে আমাকে এবার দীর্ঘকালের জন্যে সেখানে থাকতে হবে। জোহান্সবার্গে ভাল বাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যারিস্টারি করতে বসলাম। একদিকে সম্প্রদায়ের সেবা, অন্যদিকে নূতন দৃষ্টিতে গীতাপাঠ সুরু

করলাম। গীতার শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করতে লাগলাম। মনে আছে, তেরো অধ্যায় পর্যন্ত কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে গীতা সকল আচরণের গুরু হয়ে উঠল। কঠিন ইংরেজী শব্দের অর্থ জানবার জন্য যেমন ইংরেজী অভিধান দেখতে হয়, তেমনি কোন বিষয়ে সন্দেহ হ'লে গীতার মধ্যে তার উত্তর খুঁজতাম। গীতার 'অপরিগ্রহ', 'সমভাব', এসব শব্দ ত আমাকে পেয়ে বসল। সর্বত্র সমভাব কিভাবে করা যায়? যে আমার অপমান করে, যে ঘুষ নেয়, যে শত্রুতা করে, আর যে আমার খুব উপকারী—এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই?* অপরিগ্রহ কি ক'রে পালন করব? দেহটাই ত মস্ত বড় পরিগ্রহ? স্ত্রী-পুত্রাদিও ত পরিগ্রহ?

বইগুলিও কি পরিগ্রহ নয়? তাহলে কি এসব জ্বালিয়ে দিয়ে তীর্থযাত্রা করব? মনের ভেতর থেকে উত্তর পেলাম, "হাঁ, ঘর-বার জ্বালিয়ে ছাই না ক'রে দিলে তীর্থ করা যায় না।"

ইংরেজী আইন গ্রন্থের ট্রাস্টি বা 'ন্যাসরক্ষক' শব্দটির মর্ম এখন বুঝলাম। ট্রাষ্টি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রাখেন, কিন্তু তার একটি পয়সাও ভোগ করেন না। এরই নাম অপরিগ্রহ।

বোম্বাইতে এক বীমা কোম্পানির পাল্লায় পড়ে দশ হাজার টাকার বীমা করেছিলাম। অপরিগ্রহের ভাব মনে প্রবল হওয়ায় সেখানে বীমার পলিসি রদ করবার জন্যে পত্র দিলাম। এদিকে

---

* গীতার উক্তি :—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ বন্ধুষু।
সাধুস্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

বড়দার কাছে লিখলাম, "আজ পর্যন্ত যা বাঁচাতে পেরেছি তা আপনাকে দিয়েছি। কিন্তু অতঃপর আমার আশা ছেড়ে দিন। এখন থেকে যা বাঁচবে, তা এখানকার জনসেবায় লাগবে।"

এই সময় ১৯০৪ সালে আমি ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন ( ভারতীয় জনমত ) নামে একটি পত্রিকা বের করি। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয়দের যাতে ভাল হয়, তার চর্চা হ'ত। এই কাগজটিকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে অনেক অর্থ যোগাতে হয়েছিল। এই পত্রিকাখানি আমার তখনকার জীবনের প্রতিবিম্ব ছিল। আমি প্রতি সপ্তাহে ঐ পত্রিকায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতাম ও সত্যাগ্রহের স্বরূপ বুঝাবার চেষ্টা করতাম।

পত্রিকায় যা কিছু লিখতাম, বিশেষভাবে চিন্তা ক'রেই লিখতাম। মাপ-জোক ক'রে লিখতাম, যেন কোন প্রকার মিথ্যা-ভাষণ না হয়। পত্রিকাটি না থাকলে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চলতই না।

এই পত্রিকাতেই আমার লেখা আহারবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'গাইড টু হেল্‌থ্' ( স্বাস্থ্যপ্রদর্শক ) নামে ছাপা হয়। তার প্রভাব পূর্ব ও পশ্চিমের বহু পাঠকের জীবনে পরিবর্তন এনেছে।

## একটি পুস্তকের চমৎকারিত্ব

অনেক পুস্তকের দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি। কিন্তু রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' বইটি আমার মনে সবচেয়ে অধিক বিপ্লব এনেছে।

১৯০৪ সালে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন কাগজটির সুব্যবস্থা করবার জন্যে আমি জোহান্সবার্গ থেকে ডারবানে যাই। পথে দেখবার জন্যে আমার সঙ্গী মিঃ পোলক ঐ বইখানি আমার হাতে দেন। বইটি এত ভাল লাগে যে, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি। সন্ধ্যায় ডারবানে পৌঁছলাম। রাত্রিতে ঘুম হল না। ঐ বইটির নির্দেশমত জীবন-যাপনের কথা ভাবতে লাগলাম। এই পুস্তকই আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর ছাপ দিয়েছে।

এই পুস্তকের একটি অনুবাদ 'সর্বোদয়' নামে গুজরাটী ভাষায় প্রকাশ করেছি।*

আমি এতদিন মনের মধ্যে যে জিনিস অনুভব ক'রে এসেছি, এখন এই বই-এর মধ্যে তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পেলাম। অন্তরের সুপ্ত ভাবনাকে যিনি জাগ্রত করতে পারেন, তিনিই ত কবি। তাই রাস্কিন আমার কাছে কবি।

রাস্কিনের বই-এর মূল কথাগুলি এই :—(১) সকলের ভালোতে আমার ভালো। (২) যে যে-কাজ করুক না কেন তার মূল্য এক হওয়া উচিত, কারণ সকলের বেঁচে থাকার প্রয়োজন একইরূপ। (৩) মজুর ও কৃষকের জীবনই খাঁটি জীবন। প্রথম কথাটা আমি জানতাম। দ্বিতীয় কথাও আমার মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিত, কিন্তু তৃতীয় কথা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। প্রথম কথার মধ্যে অন্য দুটি কথাই আছে।

ভোর হ'তেই ঐভাবে জীবন তৈরী করতে সুরু করলাম।

* হিন্দীতেও 'সর্বোদয়' বেরিয়েছে।

## ফিনিক্স ও জোহান্সবার্গ

ডারবানে মিঃ ওয়েস্ট নামে আমার এক ইংরেজ বন্ধু 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজের ভার নিয়েছিলেন। তাঁকে সর্বপ্রথমে আমার অভিপ্রায় জানালাম।

মিঃ ওয়েস্টের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ডারবান থেকে তেরো মাইল দূরে ফিনিক্স নামে এক পল্লীতে কুড়ি একর জমি খরিদ করলাম। সেখানে একটি ছোট ঝরণা আর কিছু আম ও কমলালেবুর গাছ ছিল। কাছে আশী একর পরিমিত একটা জায়গা ছিল। সেখানে ফলের গাছ ছিল প্রচুর। একটা চালা-ঘরও ছিল। কিছুদিন পরে সেটাও খরিদ ক'রে নিলাম। অনেক ভারতীয় মিস্ত্রী আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। পার্শী রুস্তমজীও যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। একমাসের মধ্যে কারখানা তৈরী হয়ে গেল। জায়গাটা ছিল ঘাসে ও সাপে পরিপূর্ণ। ক্রমে সব পরিষ্কার ক'রে বাসের যোগ্য ক'রে তোলা হ'ল। এক সপ্তাহের মধ্যে ডারবান থেকে বহু জিনিস-পত্র এসে গেল।

আমার সঙ্গে যেসব লোক নাটালে গিয়েছিলেন, তাঁদের এই উপনিবেশে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলাম। অনেকে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় মগনলাল গান্ধীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ অনেকে ফিনিক্সে কিছুদিন থেকে পরে ধনসঞ্চয়ে মন দিলেন, কিন্তু মগনলাল সেই যে যোগ দিলেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর স্থানত্যাগ করেন নি। তিনি নিজের সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, ত্যাগ ও

শ্রদ্ধা নিয়ে আমার সকল কাজের সঙ্গী হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার সাথীদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

এইভাবে ১৯০৪ সালে ফিনিক্স স্থাপিত হ'ল। বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেই উপনিবেশ ও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চলে আসছে। প্রথমত এই কাগজটি যথাসময়ে বের করতে খুব মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল।

কাজ বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই আমাকে জোহান্সবার্গে চলে যেতে হয়। সেখানে মিঃ পোলককে ফিনিক্সের খবর দিলাম। নিজের দেওয়া পুস্তকের এই ফল ফলেছে দেখে তাঁর খুব আনন্দ হ'ল। তিনি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে ফিনিক্সে গেলেন ও সেখানকার পরিবারভুক্ত হলেন। কিন্তু আমি নিজেই তাঁকে সেখানে বেশীদিন থাকতে দিতে পারলাম না। জোহান্সবার্গের কাজ আমার একার পক্ষে খুব ভারি ছিল। তাই পোলককে সত্বর ফিনিক্স থেকে ফিরিয়ে আনতে হ'ল। ইচ্ছা ছিল পরে আমি ও তিনি উভয়ে ফিনিক্সে গিয়ে বাস করব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে সর্বোদয়ের আদর্শে নিজের জীবন ও গৃহস্থালি যতটা সম্ভব চালাবার চেষ্টা করেছি। একজন ব্যারিস্টারের বাড়িতে যতটা সাদাসিধে ভাব আনা যায়, তা আনা হয়েছিল। সব কাজ নিজের হাতে করবার চেষ্টা বাড়ল। ছেলেরাও তাতে যোগ দিল। বাজার থেকে রুটি খরিদ না ক'রে বাড়িতে তৈরী করবার জন্যে একটা জাঁতা খরিদ করা হ'ল। জাঁতাটা প্রধানত আমি, মিঃ পোলক ও ছেলেরা মিলে চালাতাম।

পায়খানার ময়লা মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারই সাফ করত। কিন্তু পায়খানার উপরটা ও আশপাশ আমরা নিজেরাই সাফ করতাম। ছেলেরাও এই কাজ করত বলে তাদের প্রথম থেকেই পায়খানা সাফ করা দুরস্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মও তারা সহজে আয়ত্ত করেছিল। কারু অসুখবিসুখ হ'লে ছেলেরা খুব আনন্দের সঙ্গে তাদের সেবা করত। তাদের আক্ষরিক শিক্ষার দিকে আমি খুব জোর দিইনি, একথা মানি। সেজন্যে তাদের কেউ কেউ আমাকে দোষও দিয়েছে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের পুঁথিগত শিক্ষা ভালভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ঘরে সময় করতে পারলাম না ব'লে তাদের সঙ্গে ক'রে আফিস পর্যন্ত নিয়ে যেতাম। আফিস ছিল প্রায় আড়াই মাইল দূরে। এইভাবে যাতায়াতে পাঁচ মাইল আমরা হাঁটতাম, রাস্তায় চলবার সময় তাদের কিছু কিছু শেখাবার চেষ্টা করতাম। অন্য কেউ সাথী থাকলে তাও হ'ত না। আফিসে তারা এক-আধটু পড়ত, না হয় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত। বড় ছেলে হীরালাল ছাড়া আর সব ছেলে এইভাবে শিক্ষা পেয়েছে। হীরালাল দেশে ছিল। যদি আমি ওদের আক্ষরিক শিক্ষা রোজ গড়ে একঘণ্টা ক'রেও দিতে পারতাম, তা' হ'লে ভবিষ্যতে তাদের ও আমার অনুতাপের কারণ থাকত না। বড় ছেলে ত নিজের মনের ব্যথা দেশকে ও আমাকে শুনিয়েছে। অন্য ছেলেরা আর উপায় ছিল না ভেবে সব সহ্য ক'রে নিয়েছে। কিন্তু এই ঘাটতির জন্যে আমি দুঃখিত নই। জনসেবার জন্যেই এ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ছেলেদের জীবন

ও চরিত্র গ'ড়ে তুলবার জন্যে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তৎসত্ত্বেও ছেলেদের চরিত্রে যদি কোন দুর্বলতা এসে থাকে ত আমি বলব যে, সে আমার ও আমার স্ত্রীর দুর্বলতার প্রতিবিম্ব মাত্র। সন্তান পিতামাতার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিও পায়। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে খানিকটা তারতম্য হয়। কিন্তু বাপদাদার কাছ থেকে যা আসে, সেইটেই ত মূল পুঁজি! অনেক ছেলে পৈতৃক দুর্বলতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নেয়, তাও দেখেছি।

জুলু বিদ্রোহের সময় আমাকে জোহান্সবার্গের বাসা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তখন ছেলেদের ফিনিক্সে পাঠিয়ে দিই এবং মিঃ পোলক পৃথক বাসা করেন।

## জুলু বিদ্রোহ

বুয়োর যুদ্ধের মত জুলু বিদ্রোহের সময়ও আমি শুশ্রূষাকারী দল গঠন ক'রে সরকারকে সাহায্য করি। ডারবানে গিয়ে দলটি গঠন করি ও ছ সপ্তাহ কাল আমরা কাজ করি। বিদ্রোহের স্থানে গিয়ে দেখি, ওটা একটা বন্ধের আন্দোলন মাত্র ছিল। বিদ্রোহের কোন চিহ্ন পেলাম না, যাই হোক, আমার সহানুভূতি এই জুলুদের দিকেই ছিল। জুলুভাইদের সেবা করতে পেরে খুশি হলাম। ডাক্তার বললেন—"গোরারা এই আহত জুলুদের সেবা করতে চায় না। আমি একা কি করি, এদের ঘা পচে যাচ্ছে, আপনারা এসেছেন,

ভালোই হয়েছে! এতে মনে হয় এই নির্দোষ লোকগুলির উপর ঈশ্বরের দয়া আছে।"

আমাদের দেখে আহত জুলুরা খুব খুশি হ'ল, তারা যুদ্ধে আহত হয়নি। অনেককে চাবুক মারা হয়েছিল, তারই ফলে ঘা হয়েছিল। বিনা চিকিৎসায় ঘা পচে যাচ্ছিল। মিত্রভাবাপন্ন জুলুদেরও ভুলে ঘায়েল করা হয়েছিল।

জুলুবিদ্রোহ যুদ্ধ ছিল না। আসলে ছিল মনুষ্য শিকার। শুধু আমার নয়, অনেক ইংরেজেরও ছিল এই মত। সকাল হলেই গোলার শব্দ শুনতে পেতাম, এই ব্যবস্থার মধ্যে আমার থাকতে মোটেই ভাল লাগত না। তবু এই তিক্ত ঔষধ গিলেও থেকে গেলাম। আমরা যদি না যেতাম, তাহলে অন্য কেউ জুলুদের সেবার ভার নিত না, এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেলাম।

## সারাজীবনের সঙ্কল্প

আহত জুলুদের সেবার জন্যে যখন বহু দূর পথ অতিক্রম করতাম, তখন মন চিন্তাসাগরে ডুবে যেত। বিশেষত ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে নানা কথা মনে উদয় হ'ত। ঈশ্বরলাভের জন্যে ত ব্রহ্মচর্য একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া নিষ্কাম সেবাকাজ করতে হ'লেও ব্রহ্মচর্যপালন ছাড়া তা করা সম্ভব নয়, এই জিনিসটা তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলাম। ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন ও সন্তান-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেবাকার্য করা দুষ্কর। একসঙ্গে দুই ঘোড়ার সওয়ার হওয়া

যায় না। এখন আমার স্ত্রী যদি গর্ভবতী হ'ত, তাহলে আমি কি আর জুলুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারতাম? সাথীদের সঙ্গেও এই বিষয়ে চর্চা করতাম।

বিবাহিত হয়েও যদি ব্রহ্মচর্য পালন করা যায়, তা হলে সেবাধর্মের ত্রুটি হয় না। মনে এইরূপ চিন্তাধারা চলছিল, এমন সময় যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল ও আমরা ছুটি পেয়ে বাড়ি গেলাম। কিছুদিন পরে এই সেবাকার্যের জন্যে গভর্নর আমার নামে ধন্যবাদ-সূচক পত্র দিয়েছিলেন।

এই সময়ই আমি ব্রত নিলাম, মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করব। তখন ঐ ব্রতের মর্ম সম্পূর্ণ বুঝিনি, ঐ ব্রত ঠিক ঠিক রক্ষা করা যে কত কঠিন—তা এখনো অনুভব করি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্রতের মহত্ত্বও প্রতিদিন অধিকমাত্রায় বুঝতে পারছি। আমার মনে হয়, ব্রহ্মচর্যহীন জীবন শুষ্ক ও পশুবৎ। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, যাতে সংযম ভঙ্গ হয় সে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করব। ব্রতের বিরুদ্ধে যতপ্রকার লোভনীয় যুক্তি ছিল সেগুলির বশীভূত হলাম না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা একটি দুর্গের মত। ঐ দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মানুষ ভয়ঙ্কর মোহ ও প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচে। ওটা আমাদের দুর্বলতা ও চাঞ্চল্যের অমোঘ ঔষধ। নিষ্কুলানন্দ ঠিকই বলেছেন, "ত্যাগ নাহি টেকে ভাই বৈরাগ্য না থাকে যদি।"

সাধক অবস্থায় যখন মোহ ও বিকার মানুষকে আক্রমণ করে তখন ব্রতই তাকে রক্ষা করবার পক্ষে অপরিহার্য। ১৯০৬ সালে এই ব্রত নিলাম। তার পূর্বে আমার স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তি করিনি।

আমার দেখে আনন্দ হ'ল যে, তিনি কোন আপত্তি করলেন না। ব্রতের পর যে আনন্দ পেলাম তার আগে তেমন আনন্দ পাই নি।

ক্রমেই আমি সত্যাগ্রহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমার অতীতের সমস্ত কাজ যেন ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে তৈরী ক'রে তুলছিল।

ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে ক্রমে মনে শান্তি পাচ্ছিলাম। এতে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমার পক্ষে এই জিনিস খুব সহজ ছিল। এই বুড়ো বয়সেও আমি অনুভব করি, এ বস্তু কত কঠিন। দিনের পর দিন আমি বুঝতে পারছি যে, এই ব্রত পালন করা তলোয়ারের উপর চলার মত কঠিন। প্রতি পলে সতর্ক ও জাগ্রত থাকতে হয়। কারণ ব্রহ্মচর্যের অর্থ হচ্ছে চিন্তায়, কথায় ও কাজে ইন্দ্রিয়সংযম।

ব্রহ্মচারী ও ভোগীর বাইরের কাজকর্ম একরকম হ'লেও দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ব্রহ্মচারী ঈশ্বর প্রীত্যর্থে সব কাজ করেন, আর ভোগী হীন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্যে কাজ করে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্যপালন খুব কঠিন হ'লেও ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ ক'রে নিরন্তর চেষ্টা করলে সফলকাম হওয়া যায়।

## গৃহে সত্যাগ্রহ

১৯০৮ সালে আমার প্রথম জেল হয়। জেলে কয়েদীদের জন্যে যেসব নিয়মকানুন আছে সংযমী বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সেগুলি

স্বেচ্ছায় পালন করা উচিত। যেমন দিনের বেলায়ই ভোজন শেষ করা, মাদকসেবন না করা, স্বাদের জন্যে কিছু না খাওয়া ইত্যাদি। এতে কয়েদীদের কষ্ট হয় ঠিক, কিন্তু ব্রহ্মচর্যের পক্ষে এ সব অত্যাবশ্যক। তবে জেলে বাধ্যতামূলক ব'লে তাতে কোন লাভ হয় না। স্বেচ্ছায় পালন করলেই এর সুফল পাওয়া যায়। এজন্যে জেল থেকে বেরিয়ে ঐগুলি স্বেচ্ছায় পালন করবার চেষ্টা করেছি। একবার একটি ঘটনায় আমি প্রায় দশ বছর নুন খাওয়া ছেড়ে দিই। বইতে পড়েছিলাম পৃথক নুন খাওয়া অনাবশ্যক। বিশেষতঃ যারা দুর্বল, তাদের পক্ষে নুন ও ডাব না খাওয়া উচিত।

একবার কস্তুরবার খুব রক্তস্রাব হয়। জলচিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার পাওয়া গেল না। কস্তুরবার জলচিকিৎসায় খুব বিশ্বাস না থাকলেও নিতান্ত অরুচিও ছিল না। তাকে বললাম, "তুমি ডাল আর নুন খাওয়া ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস তাতে খুব উপকার হবে।" অনেক বোঝালাম, কিন্তু কস্তুরবা কিছুতে রাজী হ'ল না, বললে, "তোমাকে যদি ডাক্তার নুন আর ডাল ছেড়ে দিতে বলে, তা হলে তুমিও হয়ত রাজী হবে না।" এই কথায় মনে আঘাত পেলাম। একটু আনন্দ হ'ল—কারণ, দেখলাম নিজের পরিচয় দেবার সুযোগ এসেছে।

বললাম, "ভুল বুঝেছ, আমাকে কোন ডাক্তার নুন ও ডাল ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক বললে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতাম। আচ্ছা, তুমি ছাড় আর না ছাড়, আমি তোমার জন্যে আজ থেকে এক বছর নুন আর ডাল ছেড়ে দিলাম।" এই শুনে কস্তুরবা অত্যন্ত

কাতর হয়ে পড়লেন, বললেন, "দোহাই তোমার। তোমার স্বভাব জানা সত্ত্বেও কথাটা ব'লে ফেলেছি। আমি আজই নুন ডাল ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার ছাড়ার কোন দরকার নেই। তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও।" আমি বললাম, "সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না, আমি নুন ডাল না খেয়ে থাকতে পারব। তুমিও মনে বল পাবে। আমার বিশ্বাস, নুন আর ডাল ছেড়ে দিলে তোমার উপকারই হবে।" স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তুমি বড় একগুঁয়ে। কারু কথা মানা তোমার কোষ্ঠীতে নেই।" এই বলে কাঁদতে কাঁদতে চুপ করলেন।

এই ঘটনা সত্যাগ্রহের দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম।

এর পর কস্তুরবার শরীর খুব ফিরে যেতে লাগল। অবশ্য সেটা নুন ডাল ছাড়ার ফল, অন্যরূপ আহারসংযমের ফল, অন্যান্য নিয়ম-পালনের ফল, অথবা এই ঘটনাসঞ্জাত মানসিক আনন্দের ফল, তা আমি বলতে পারি না। যে কারণেই হোক্, কস্তুরবার রক্তস্রাব বন্ধ হ'ল, শরীর শুধরে গেল এবং বৈদ্য হিসাবে আমার হাতযশও বাড়ল।

এর পর আহারের সংযম ও উপবাস সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা করেছি। বহুকাল দুধ ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেবল ফল খেয়ে থাকবার চেষ্টাও করেছি। মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়াতে যথেষ্ট ফল পেয়েছি। (আহার সম্পর্কীয় এইসব পরীক্ষার ফল, মূল আত্ম-জীবনীতে দেওয়া আছে।)

## ওকালতির স্মৃতি

দক্ষিণ আফ্রিকায় উকিল জীবনের কিছু স্মৃতি এখানে দিতে চাই।

ছাত্রজীবনে শুনেছিলাম, মিথ্যা কথা না বললে ওকালতি করা যায় না। কিন্তু মিথ্যা কথা ব'লে টাকা-পয়সা জমাবার বা নাম করবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতির সময় আমি একবারও মিথ্যা কথা বলেছি মনে হয় না। ওকালতির অনেকটা অংশ জনসেবাতেই যেত। পকেট খরচ হিসেবে কখনও কিছু নিতাম, কখনও তাও ছেড়ে দিতাম। মক্কেলকে আগেই ব'লে দিতাম, "যদি মোকদ্দমা মিথ্যে হয় ত আমার কাছে এসো না। সাক্ষী তৈরি করবার আশা আমার কাছে ক'রো না।" এর পর আমার কাছে কেউ মিথ্যা মোকদ্দমা আনতই না। এমন মক্কেলও ছিল, যারা সাচ্চা মামলাই আমার কাছে আনত, আর যাতে কোন গোলমাল থাকত, তা অন্য উকিলের কাছে নিয়ে যেত।

জোহান্সবার্গের একটি ঘটনা মনে পড়ে। এক মক্কেলের মামলা চালাতে গিয়ে বুঝলাম যে, আমার মক্কেল আমাকে ধাপ্পা দিয়েছে।

আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, "এই মোকদ্দমা খারিজ ক'রে দিন।" বিরোধী পক্ষের উকিল এতে খুব অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট খুশি হলেন। এই ঘটনার ফল ভাল হয়েছিল; এর প্রভাব আমার সঙ্গী উকিলদের উপরও যথেষ্ট পড়েছিল।

পার্শী রুস্তমজীর নাম দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়েছিল। সার্বজনিক কাজে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি একবার খুব বিপদে পড়ে যান। বোম্বাই ও কলিকাতা থেকে তাঁর বহু মালপত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় যেত। অনেক মাল তিনি গোপনে বিনাশুল্কে আমদানী করতেন। একবার এই চুরি ধরা পড়ে গেল। রুস্তমজী বিপদে পড়ে আমাকে এসে ধরলেন। বললেন, "ভাই, তোমাকে আমি ধোঁকা দিয়েছি। এবারে আমাকে বাঁচাও।" আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "আপনি যদি নিজের দোষ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন ত আমি চেষ্টা করব।", তিনি কাঁচুমাচু করলেন, তাঁর উকিল বিরোধিতা করলেন ; তবু তিনি শেষ পর্যন্ত আমার কথামতই দোষ স্বীকার করলেন। আমি এটর্নি জেনারেল ও চুঙ্গি অফিসারকে সমস্ত কথা ঠিক বুঝিয়ে বললাম।

তাঁরা আমার কথায় বিশ্বাস করলেন ও খুশি হলেন। শেষে রুস্তমজীকে কিছু অর্থদণ্ড ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

রুস্তমজী এই চুরির বিবরণ লিখে আয়নায় বাঁধিয়ে নিজের আফিসে টাঙ্গিয়ে রাখলেন এবং তাঁর বংশধর ও অন্যান্য ব্যাপারীরা যাতে কদাচ এই কুকর্ম না করে সেজন্যে সাবধান ক'রে দিলেন।

---

২

## সত্যাগ্রহের জন্ম

জুলু-বিদ্রোহের পর যখন আমি ফিনিক্সে বাস করছিলাম, তখন খবর পেলাম যে—১৯০৬ সালের ২২শে আগস্টের অতিরিক্ত সরকারী গেজেটে একটি অর্ডিনান্সের মুসাবিদা ছাপা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের একপ্রকার তাড়িয়ে দেওয়া। ঐ অর্ডিনান্সের মর্ম ছিল—'আট বছর বা তার বেশী বয়সের প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ ভারতীয়কে ট্রান্সভালে থাকতে হ'লে এসিয়াটিক বিভাগের রেজিস্টারে নাম রেজিস্ট্রি করাতে হবে ও রেজিস্ট্র পরোয়ানা নিতে হবে। নূতন পরোয়ানা নেবার সময় পুরাতন পরোয়ানা ফেরত দিতে হবে। সরকারী কর্মচারীরা দরখাস্ত নেওয়ার সময় দরখাস্তকারীর শারীরিক চিহ্ন, টিপসই ইত্যাদি নেবে। যে ব্যক্তি যথাসময়ে নাম রেজিস্ট্রি করাবে না, ট্রান্সভালে থাকবার অধিকার তার থাকবে না। নাম রেজিস্ট্রির দরখাস্ত না দিলে আইন অনুসারে জেল বা জরিমানা হবে। যদি আদালত মনে করেন, দেশ থেকে তাড়িয়েও দিতে পারবেন।'

আমরা সকলেই বুঝলাম যে অবস্থা অতি গুরুতর। একটি জনসভা ডাকা হ'ল, তাতে একটি প্রস্তাব নেওয়া হ'ল। তার মর্ম এই

ছিল যে—ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিরোধিতা করবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে। তবুও যদি বিল পাশ হয়, তবে ভারতীয়রা তা মানবে না; আর এই আইন অমান্যের জন্যে যত দুঃখ আসুক না কেন সহ্য করা হবে।

এই রকমের আন্দোলনকে ঐ সময় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা হ'ত, পরে ওর নাম রাখা হ'ল সত্যাগ্রহ।

আমাদের আন্দোলন সত্ত্বেও ঐ বিল পাশ হয়ে গেল। পিকেটিং করা সত্ত্বেও কোন কোন ভারতীয় নাম রেজিস্ট্রি করাল, তাদের সংখ্যা ৫০-এর বেশী নয়। ধরপাকড় সুরু হ'ল। রামসুন্দর নামে একটি লোক খুব বাচালতা ও বাহাদুরি করত। সে ধরা প'ড়ে খুব বিখ্যাত হয়ে গেল। তার একমাস সাজা হয়, জেলে তাকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয়। বাইরে ভারতীয়রা তাকে বিরাট ভাবে অভিনন্দিত করে। তৎসত্ত্বেও রামসুন্দর শেষে ট্রান্সভাল ও আন্দোলন দু-ই ছেড়ে দিয়ে চম্পট দেয়। এতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, প্রতি আন্দোলন খাঁটি লোক নিয়েই সুরু করা উচিত।

রামসুন্দরের গ্রেপ্তারে ভারতীয়দের উৎসাহ বেড়ে গেল। ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে আন্দোলন সম্পর্কে সমস্ত কথা খোলাখুলি প্রকাশ করা হ'ত। কর্তৃপক্ষ পরে ভাবলেন যে, নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে গ্রেপ্তার না করলে আন্দোলন চাপা পড়বে না। এজন্যে তারা কয়েকজন নেতাকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আদালতে হাজির হওয়ার হুকুম দিলেন। আদালতে গেলে আমাদের উপর হুকুম দেওয়া হ'ল—আমরা যেন অবিলম্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

ট্রান্সভাল ত্যাগ করে যাই। আমরা এই আদেশ অমান্য করলাম। ১৯০৮ সালের ১০ই জানুয়ারী দণ্ড নেওয়ার জন্যে আদালতে গেলাম, আইনের বিধান অপেক্ষা অধিক সাজা দেওয়ার জন্য হাকিমকে অনুরোধ করলাম, তিনি কিন্তু আমাকে মাত্র ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। যে আদালতে আমি শত শত বার উকিল হয়ে ওকালতি করেছি, সেখানে আজ আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। ওকালতি করবার তুলনায় এই অবস্থাকে অধিক সম্মানজনক মনে হ'ল।

বিচারের পর আমাকে ও সঙ্গীদের পুলিস জোহান্সবার্গের জেলে নিয়ে গেল। আমাদের সকলকে নিয়ে একটি বড় কামরায় রাখা হয়। সন্ধ্যায় কামরাটির দরজা বন্ধ করা হ'লে মনে হ'ল আমরা যেন একটি বিরাট সিন্দুকে আছি। কারণ দরজার কপাটে কোন ফাঁক ছিল না। নীচে কোন জানালাও ছিল না, অনেক উপরে বায়ু যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র জানালা ছিল।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন দলে দলে সত্যাগ্রহী আসতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল ফেরিওয়ালা। এক সপ্তাহের মধ্যে শতখানেক সত্যাগ্রহী এসে গেল। ক্রমে আরো আসতে লাগল, সেজন্যে বাইরের খবর পেতে অসুবিধা হ'ল না।

সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যখন পরপর বাড়তে লাগল, তখন ক্রমে কঠোর দণ্ড দেওয়া চলল।

জেলের খাদ্য পরিমাণে ছিল অল্প, স্বাদও ছিল জঘন্য। মসলা, নুন ও জল দেওয়া হ'ত না। আপত্তি করায় ডাক্তার বললেন,

"কয়েদীর পক্ষে এত আবদার ভাল নয়।" কিন্তু জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের খাবার আমাদেরই তৈরী ক'রে নিতে অনুমতি দিলেন। আমরা ঠিক করেছিলাম, যত অসুবিধাই হোক্ না কেন, আনন্দে জেলের দিনগুলি কাটাব।

দুই সপ্তাহের মধ্যে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা প্রায় দেড়শয় দাঁড়াল। নূতন সত্যাগ্রহীরা এসে খবর দিল যে, সরকারের সঙ্গে আপোসের কথাবার্তা চলছে। আমাকে জেনারেল স্মাট্‌স্‌এর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি বললেন—"ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় পরোয়ানা বদল ক'রে নিক্। তাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই নূতন পরোয়ানা তৈরী করা হবে। যদি সকলে এই কাজ করে ত, এই আইন উঠে যাবে এবং কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হবে।" সত্যাগ্রহী হিসেবে আমি এতে সায় দিলাম।

আমি জেল থেকে বেরিয়ে মিটমাটের শর্ত সকলকে বুঝিয়ে দিলাম। প্রায় হাজার লোকের একটি সভা হ'ল। সভায় দু'জন পাঠান ছাড়া আর সকলে আপোসের শর্তগুলি মেনে নিল। এই দু'জন পাঠান ভেবেছিল—স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।

১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি আমরা অনেকে পরোয়ানা নিতে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। সকলকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল, যেন প্রত্যেকে যে-যার পরোয়ানা নিয়ে আসে। এও স্থির হয়েছিল যে, প্রথমদিনে কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে পরোরানা নিতে হবে।

আমার আফিসেই সত্যাগ্রহ-সমিতির কাজ চলত। আমি সেখানে পৌঁছেই আফিসের বাইরে উক্ত পাঠানদ্বয়, মীর আলম ও তার বন্ধুকে দেখলাম। মীর আলম আমার পুরোনো মক্কেল ছিল; সব কাজে আমার পরামর্শ নিত। ছ'ফুট উঁচু জোয়ান পুরুষ, দোহারা চেহারা। এই প্রথমবার তাকে আফিসের বাইরে এই ভাবে থাকতে দেখলাম। এর আগে সে সর্বদা আফিসের ভিতরে গিয়ে বসত। আমাকে দেখে সে আজ সেলাম করল না :—এও এই প্রথম। আমি যখন সেলাম করলাম, সেও করল। এইসব দেখে আমার সন্দেহ হল, একটা কিছু গোলমাল হবেই।

কিছু পরে কয়েক জনের সঙ্গে এসিয়াটিক আফিসের দিকে রওনা হলাম। মীর আলম ও তার সঙ্গী পিছু নিল। এসিয়াটিক আফিস এক মাইলের মধ্যে ছিল। একটা বড় রাস্তা দিয়ে সেখানে যেতে হ'ত। আফিসে পৌঁছতে ৪।৫ পা বাকী আছে, এমন সময় মীর আলম আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ?" আমি বললাম, "দশটা আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নিয়ে আসব! তুমি যদি যাও ত তোমাকে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে না। তোমার পরোয়ানা আগে বের ক'রে পরে আমার আঙ্গুলের ছাপ দেব।" এই কথা যখন বলছিলাম তখন আমার পিছন থেকে এক ঘা লাঠি আমার মাথায় পড়লো। আমি বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে গেলাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "হা রাম!" এর পর কি হয়েছিল জানি না; কিন্তু মীর আলম ও তার বন্ধু আমার উপর আরও লাঠি ও লাথি চালিয়েছিল। একটা শোরগোল হয়েছিল।

রাস্তার লোক ও গোরারা মিলে মীর আলম ও তার সাথীকে ধ'রে ফেলল এবং পুলিস এসে তাদের গ্রেপ্তার করল।

নিকটেই এক ইউরোপীয়ানের অফিস ছিল। আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিছু পরে আমার চৈতন্য হ'লে তাকিয়ে দেখি, রেভারেণ্ড ডোক আমার উপর ঝুঁকে আছেন। তাঁর কাছে খবর পেলাম, মীর আলম ও তার বন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছে। আমি বললাম, "তাদের মুক্তি পাওয়া দরকার।" তিনি বললেন, "সে সব হবে, আপনি আগে সেরে উঠুন।" তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি রাজী হলাম। ইতিমধ্যে এসিয়াটিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মিঃ চমনীও এসে পৌঁছলেন এবং আমাকে একটা গাড়িতে তুলে রেঃ ডোকের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি তাঁকে বললাম—"আমি ভেবেছিলাম, আপনার আফিসে গিয়ে আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নেব, কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় তা নয়। এখানেই আপনি আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পরোয়ানা দিন। আমি সকলের আগেই পরোয়ানা নিতে চাই।" তিনি বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কি? আপনি সেরে উঠুন। অন্য লোককে আগে পরোয়ানা দিলেও আপনার নাম প্রথমেই রাখব।" আমি বললাম, "তা হবে না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বেঁচে থাকলে আমিই আগে পরোয়ানা নেব।" অগত্যা মিঃ চমনী সেই ব্যবস্থা করলেন।

পরে আমি সরকারী উকিলের কাছে মীর আলম প্রভৃতিকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তার করলাম। ফলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু জোহান্সবার্গের গোরারা সরকারী

উকিলের কাছে এক লম্বা চিঠি দিয়ে জানাল—"অপরাধীদের সাজা দিতে হবে। মিঃ গান্ধী নিজে মাফ কর্‌তে পারেন, কিন্তু আইনের চক্ষে তারা দোষী।" তাই তাদের আবার গ্রেপ্তার ক'রে ৬ মাসের সাজা দেওয়া হ'ল। সুখের বিষয়, আমাকে আর সাক্ষী মানা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। রেভারেণ্ড ডোকের বাড়িতে ডাক্তার এসে আমার আঘাত পরীক্ষা করলেন। ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল, সেলাই করলেন। পাঁজরা পরীক্ষা করে মালিশ দিলেন। কথা বলা প্রায় বন্ধ ক'রে দিলেন। হাতে ইশারা ক'রে কাজ চালাতে হ'ল।

আমি একজনের দ্বারা এই মর্মে এক পত্র লিখিয়ে সম্প্রদায়ের নিকট পাঠালাম ঃ—"আমার অবস্থা ভাল। মিঃ ও মিসেস্ ডোক আমার জন্য প্রাণ ঢেলে দিচ্ছেন, আমি সত্বর কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠব। আক্রমণকারীদের উপর আমার কোন রাগ নেই। তারা অজ্ঞতার জন্যে এমন কাজ করেছে, তাদের উপর কোন মামলা চালানো হবে না। এ ঘটনার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়ার বদলে যেন প্রেম বাড়ে—ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা। আমার উপর মার পড়েছে, আরও হয়ত পড়বে, তবু আপনাদের এই পরামর্শ দেব, যেন সকলে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নেয়। এতেই সম্প্রদায়ের কল্যাণ হবে। আমরা যদি খাঁটি সত্যাগ্রহী হই, তবে মারের ভয়ে দমে যাব না ইত্যাদি।"

## আবার সত্যাগ্রহ

ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চুক্তির শর্তানুসারে এসিয়াটিক আইন বা কালা আইন রদ করা হ'ল না, উপরন্তু যা স্বেচ্ছায় নেওয়া হয়েছিল, তাকে বাধ্যতামূলক করা হ'ল। অবশ্য যারা আগে স্বেচ্ছায় পরোয়ানা নিয়েছিল—তাদের রেহাই দেওয়া হ'ল।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। জেনারেল স্মাট্স্-এর কাছে পত্র লিখে কোন উত্তর পেলাম না। তখন ট্রান্সভাল সরকারের নিকট পত্র লিখে জানালাম যে, যদি কালা কানুন যথাসময়ে রদ করা না হয়, তবে সমস্ত পরোয়ানা আমরা জ্বালিয়ে দেব, আর সেজন্য যে দুঃখই আসুক না কেন সহ্য করব।

যথাসময়ে কোন উত্তর না আসায়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দু ঘণ্টা পরে এক সভার অধিবেশন হ'ল। সভা আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই এক তার পাওয়া গেল—সরকার পক্ষ জানালেন যে, তাঁরা মত পরিবর্তন করতে পারবেন না। তাদের সংবাদ প্রতিকূল হওয়ায় সকলে খুশিই হ'ল, কারণ অনুকূল উত্তর পেলে পরোয়ানা জ্বালাবার আনন্দটা উপভোগ করা যেত না।

প্রায় দু'হাজার পরোয়ানা একত্র ক'রে সভার সমক্ষে আগুন লাগিয়ে ছাই করা হ'ল। যতক্ষণ পরোয়ানাগুলি জ্বলছিল—ততক্ষণ সভার লোকেরা দাঁড়িয়ে থেকে হাততালি দিচ্ছিল।

ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমস্ত খবর যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশনে দ্বিতীয় এসিয়াটিক বিল মঞ্জুর করা হয়—সেই অধিবেশনেই জেনারেল স্মাটস্ 'ইমিগ্র্যাণ্ট্স্ রেস্ট্রিকশান্ বিল' নামে আর একটি বিল উপস্থিত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নূতন কোন ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

এই আইনেরও বিরোধিতা না ক'রে উপায় ছিল না। কাজেই আবার সত্যাগ্রহ সুরু হ'ল। গত হু'ছরে নাটাল থেকে অনেকে এসে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের জন্যে সত্যাগ্রহ ক'রে জেলে গিয়েছিল। এখন ট্রান্সভালের লোকেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিল। জেলে কয়েদীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সরকার এখন জেলে দেওয়ার বদলে ভারতীয়দিগকে জোরপূর্বক দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। এতে কেউ কেউ যে তুর্বল হয়ে পড়েনি, তা নয়; কিন্তু বহু ভারতবাসী দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল।

## টলস্টয় আশ্রম

যারা সত্যাগ্রহ ক'রে জেলে যাচ্ছিল, তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। সেজন্য মিঃ কেলেমবেক আমাদের হাতে ১১০০ একর জমির একটা প্লট দিয়েছিলেন। জায়গাটা জোহান্সবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে।

সেখানে বহু গাছপালা, একটি ছোট টিলা, একটি ছোট ঘর, ছুটো কূয়া, একটা পরিষ্কার জলের ঝর্ণা ইত্যাদি ছিল।

এই জায়গাতেই ঘর তৈরী ক'রে সত্যাগ্রহীদের পরিবারবর্গকে একত্র রাখা স্থির করলাম। নিয়ম করা হ'ল, ঘর তৈরী, চাষবাস বা গৃহস্থালির কাজকর্ম চাকর দিয়ে করান হবে না। এজন্যে প্রত্যেক বাসিন্দাকে পায়খানা সাফ করা থেকে রান্না পর্যন্ত সমুদয় কাজ স্বহস্তে করতে হবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রথম থেকে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হ'ল। এই উদ্দেশ্যে পরস্পর থেকে দূরে দূরে ঘর তৈরী করা হয়েছিল। পাঠশালা, ছুতোর মিস্ত্রীর কারখানা, চামড়ার কাজের কারখানা ইত্যাদির জন্যেও ঘর তৈরী করতে হয়েছিল। বাসিন্দাদের মধ্যে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, গুজরাট ও উত্তর ভারতের লোক ছিল, ধর্মবিশ্বাসের দিক্ থেকে তারা ছিল হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টান। প্রায় ৪০ জন যুবক, ২।৩ জন বৃদ্ধ, ৫ জন স্ত্রীলোক এবং ২৫।৩০টি শিশু ছিল। তাদের মধ্যে ৪।৫টি অবিবাহিতা মেয়েও ছিল।

ছুর্বল লোকেরাও এই আশ্রমে এসে পরিশ্রমের কাজ করতে লাগল। সকলকে কোন-না-কোন কাজে জোহান্সবার্গে যেতে হ'ত। আমিও দরকার মত যেতাম। নিয়ম করা হ'ল—যারা বেড়াতে যাবে, তারা হেঁটেই যাবে, আর যারা সার্বজনিক কাজের জন্যে যাবে তারা রেলের ভাড়া পাবে। রাস্তায় জলযোগের জন্যে কিছু দেওয়া হবে; কিন্তু শহরের খাওয়া-খরচ দেওয়া হবে না। আশ্রম থেকে সাদাসিধে জলখাবার নিয়ে যেতে দেওয়া হ'ত।

এভাবে অল্পখরচে সমবেতভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভেবেছিলাম—সকলকে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পারলে দীর্ঘকাল যাবত আশ্রম চলবে। আমরা একটি জুতোর কারখানা খুলেছিলাম। নিকটবর্তী এক জার্মান ক্যাথলিক মঠে চপ্পল (স্যাণ্ডাল) তৈরী শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মিঃ কেলেমবেক সেই মঠে গিয়ে চপ্পল তৈরী শিখে এলেন ও আমাদের শেখালেন। আমি নিজে কয়েক ডজন চপ্পল তৈরী করেছিলাম। আমার কয়েকটি চেনা লোক এই কাজে খুব দক্ষতা লাভ করেছিলেন। ঐ সব জুতা আমরা বন্ধুদের মধ্যে বিক্রি করতাম।

ছুতার মিস্ত্রীর কাজও সুরু করা হ'ল। বেঞ্চ থেকে সিন্দুক পর্যন্ত সব ছোটখাট জিনিসই আমরা নিজেরাই তৈরী ক'রে নিতাম। একটা পাঠশালা খোলা হয়। তার দায়িত্ব মিঃ কেলেমবেক ও আমার উপর ছিল। বিকেলে ক্লাস বসত। অন্য সময় পরিশ্রম করবার জন্যে আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে থাকতাম। তাই পড়ানোর সময় ঘুমে ঢুলে পড়তাম; মাঝে মাঝে চোখে জলের ঝাপটা নিতাম। এই ভাবে কষ্টেসৃষ্টে ক্লাস চালাতাম। সব চেয়ে মুস্কিল ছিল—তামিল, তেলেগু ও গুজরাটী-ভাষাভাষী ছাত্রদের একসঙ্গে কি ভাবে পড়ান যায়। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তামিল কিছু কিছু আমি জানতাম, কিন্তু তেলেগু একেবারেই না। এক্ষেত্রে একা আমি কি করতে পারি? কিন্তু শিক্ষাদান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল না। ছেলেরা কখনো

অসহিষ্ণু হয়নি, পরস্পরের ধর্ম ও রীতিনীতির আদর করতে তারা শিখল, শিষ্টাচার শিখল এবং উদ্যমী হ'ল।

সেইসব ছেলের মধ্যে যারা এখনো আমার পরিচিত, তাদের কাজকর্ম দেখলে মনে হয় টলস্টয় আশ্রমের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।

## ভালোমন্দের মিল

টলস্টয় আশ্রমে থাকার সময় একটা সমস্যা দেখা দিল। কতকগুলি ছেলে ছিল খুব দুরন্ত ও বদমায়েস প্রকৃতির। মিঃ কেলেমবেক বললেন, "আপনার ছেলেরা যদি দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে থাকে, তা হলে ওদের মতো বিগড়ে যেতে পারে। ভালো মন্দ সব ছেলেকে এক সঙ্গে রাখা আমার ভাল মনে হয় না।" আমার কিন্তু দুষ্ট ছেলেদের পৃথক্ ক'রে দেওয়া ভাল মনে হ'ল না। মিঃ কেলেমবেককে বল্‌লাম, "দেখুন, এই দুষ্ট ছেলেগুলির ভার আমরা নিয়েছি, এখন বিদায় ক'রে দিতে পারি না। আমার ছেলেদের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে, তবে তা ওদের মধ্যে সংক্রামিত হবেই। ভালো ছেলে ও মন্দ ছেলে একসঙ্গে থাকলে ভালো ছেলে খারাপ হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। ভালমন্দের মাঝখানে পড়লে বিচার শক্তি বাড়ে। যারা ভাল, তারা মন্দ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখে। তা ছাড়া পৃথক ক'রে দিলে আমার ছেলেদের মধ্যে একটা আত্মাভিমান জাগবে, সেটা হ'তে দেওয়া উচিত নয়। কাজেই ওরা যেমন আছে থাকুক।"

এর ফল যে খারাপ হয়েছিল,—তা বলতে পারি না। আমার ছেলেদের কোনই ক্ষতি হয়নি, বরং এই লাভ হয়েছিল যে—

তাদের মধ্যে যদি কোন বড়মানুষি ভাব ছিল, তা চলে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে মিলেমেশে থাকতে তারা অভ্যস্ত হয়েছিল। মা-বাপ যদি ভালভাবে নজর রাখে, তা হলে ভাল ছেলে ও মন্দ ছেলে এক সাথে থাকলেও ভাল ছেলেদের কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের খুব সতর্ক থাকতে হয়।

ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া ও মানুষ ক'রে তোলা যে কত কঠিন, তার অনুভব এই সময় আমাদের হয়েছিল।

কিন্তু সত্যাগ্রহী বন্দীরা জেল থেকে বেরিয়ে এলে পর তাদের আত্মীয়স্বজনরা বাড়ি চ'লে গেল এবং টলস্টয় আশ্রমের লোক-সংখ্যা খুব ক'মে গেল। যারা থাকল—তারা প্রধানত ফিনিক্স-বাসী। এজন্য আশ্রমটি ফিনিক্সে নিয়ে গেলাম। আশ্রমবাসীদের সেখানে রেখে আমি জোহান্সবার্গে গেলাম। কিছুদিন সেখানে থাকবার পর আমি দু'জন আশ্রমবাসীর অধঃপতনের সংবাদ পেলাম। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে বিফলতার সংবাদে খুব চিন্তিত হতাম না। কিন্তু এই সংবাদে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। সেদিনই ফিনিক্স যাত্রা করলাম। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম, এ অবস্থায় আমার কর্তব্য কি? যারা আমাদের রক্ষণাধীন আছে, তাদের দোষত্রুটির জন্যে আমরা নিশ্চয়ই দায়ী। স্ত্রী ত আগেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি স্বভাবত বিশ্বাসশীল, সেজন্যে তাঁর সাবধানবাণীতে কান দিই নি। তবু আমার বিশ্বাস হ'ল যে—যাদের পতন হয়েছে তাদের জন্যে আমি যদি প্রায়শ্চিত্ত করি, তা হ'লে তারা নিজেদের দোষের গুরুত্ব

বুঝবে। এজন্যে আমি সাত দিন উপবাস ও সাড়ে চার মাস এক বেলা ভোজন করব স্থির ছিল।

এই সিদ্ধান্ত করবার পর আমার মন হাল্কা হ'য়ে গেল। অপরাধীদের উপর ক্রোধের পরিবর্তে দয়ার সঞ্চার হ'ল।

ট্রেনে এই সব চিন্তা করতে করতে ফিনিক্সে পৌঁছলাম। সব খবর নিয়ে পূর্বসঙ্কল্পমত উপবাস সুরু করলাম। মিঃ কেলেমবেক আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষে তিনিও আমার মতে সায় দিলেন এবং আমার মতই প্রায়শ্চিত্ত করা স্থির করলেন। উপবাসের ফলে সেখানকার হাওয়া অনেকটা পবিত্র হ'ল, পাপের ভীষণতা সবাই বুঝল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিকটতর হ'ল। এই উপলক্ষ্যে কিছুদিন পরে আবার আমাকে দুই সপ্তাহকাল উপবাস করতে হয়েছিল। তার ফলও আশাতীত হয়েছিল। স্থল-বিশেষে এমন উপবাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যখন তখন এরূপ করা উচিত নয়। যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পবিত্র প্রেমের সম্পর্ক নেই, যেখানে ছাত্রের দোষ দেখে শিক্ষকের মনে প্রকৃত আঘাত লাগে না, আর যেখানে শিক্ষকের উপর ছাত্রের শ্রদ্ধা নেই—সেখানে উপবাস নিরর্থক, এমন কি ক্ষতিকর।

## সত্যাগ্রহে ভগিনীদের অংশ

১৯১২ সনের শীতকালে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও সত্যাগ্রহীদের মধ্যে মিট-

মাট করান। জেনারেল বোথার সঙ্গে দেখা ক'রে এসে তিনি আমাদের আশা দিলেন যে, শীঘ্রই মীমাংসা হ'য়ে যাবে, ৩ পাউণ্ড কর আসছে বছরেই উঠে যাবে।

দ্বিতীয় বছর এল, কিন্তু আমাদের আশা পূর্ণ হ'ল না। ১৯১৩ সালে টলস্টয় আশ্রমের অধিবাসীদিগকে ঐ ৩ পাউণ্ড কর উঠাবার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের জন্য তৈরী হ'তে হয়েছিল।

এ পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের সত্যাগ্রহে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবারে এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে তাদের সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল। আদালতের একটা মামলায় বিচারক সিদ্ধান্ত করলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল খ্রীষ্টধর্মসম্মত বিবাহই আইনসঙ্গত ব'লে গণ্য হবে। এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুসারে হিন্দু-মুসলমান-পার্শী সব সম্প্রদায়ের বিবাহই অসিদ্ধ হ'য়ে গেল। তাদের ধর্মপত্নীরা রক্ষিতা ছাড়া আর কিছু রইল না। কাজেই এখন স্ত্রীলোকদের সত্যাগ্রহ থেকে আর দূরে রাখা সম্ভব হ'ল না। প্রথমতঃ টলস্টয় আশ্রমের স্ত্রীলোকদের আহ্বান করা হ'ল। তারা নিজেরাই খুব উৎসুক ছিল। সত্যাগ্রহের সমস্ত বিপদ, জেলের কষ্ট ইত্যাদি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তাতে কেউ ভয় পেল না। গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোক ও অনেক ছোট ছোট শিশুর মা সকলেই সত্যাগ্রহ করতে উৎসুক হ'ল। নাটাল ও ট্রান্সভালের মধ্যে ভারতীয়দের বিনা পরোয়ানায় যাতায়াত বে-আইনী ছিল। মেয়েরা ঐ আইন ভঙ্গ করবে ঠিক হ'ল। পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেবে,

তারা নাটালের অন্তর্গত নিউ কাসলের কয়লাখনিতে গিয়ে ভারতীয় মজুরদের কাজ ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করবে।

এরপর ফিনিক্সে গেলাম। ফিনিক্সের মেয়েদের সঙ্গে আগে কথা বললাম। তাদের সম্পর্কে আমার একটু সঙ্কোচ ছিল; কারণ, টলস্টয় আশ্রমের মেয়েদের মত তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। এরা যদি জেলে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে না পারে এবং মাফ চেয়ে বসে ত আমাদের মুস্কিল হবে, লড়াইও শিথিল হয়ে যাবে। আমি আমার স্ত্রীকে নিজে উৎসাহিত করতে ইচ্ছুক ছিলাম না; কারণ, তিনি যদি নিজে উৎসাহ বোধ না করেন এবং আমার উৎসাহেই সত্যাগ্রহে যোগ দেন, তা'হলে হয়ত ফল ভাল হবে না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বললাম এবং তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে চাইল। তারা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করবে প্রতিজ্ঞা করল। আমার স্ত্রী এসব দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "তুমি সবাইকে বলছ, আমাকে কিছু বলছ না কেন? আমিও ত ঐ পথে যেতে চাই, আমার মধ্যে কী দুর্বলতা দেখলে, যেজন্যে আমাকে বিশ্বাস করছ না?" আমি বললাম, "অবিশ্বাসের কোন কথা নেই, তোমার কথায় খুশি হলাম। আমি নিজের খুশি মত তোমাকে জেলে পাঠাতে চাই না, এ সব কাজ সকলেরই নিজের সাহসে করা উচিত। আমার কথামত গিয়ে যদি তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাক বা জেলের কষ্ট সহ্য করতে না পার ত আমার অবস্থা কি হবে?" উত্তর পেলাম—"যদি দুর্বলতা দেখিয়ে ফিরে আসি, তাহ'লে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রো। তুমি কি ক'রে কল্পনা করলে যে, তুমি যে কষ্ট সহ্য করতে পার, আমার

ছেলেরা যা পারে, আমি তা পারব না? আমাকে তোমার এই যুদ্ধে নিতেই হবে।" আমি বললাম—"তাহ'লে নিয়েই নেব। তুমি আমার শর্ত জান, স্বভাবও জান,—এখনও কিছু ভাববার থাকে ত ভেবে নাও, এগিয়ে যাবার আগে নিজের মত বদলালে কোন লজ্জা নেই।" সে বলল, "আমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি ঠিক ক'রেই ফেলেছি।"

সকলকে বারবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলাম যে, যে কোন বিপদই আসুক না কেন কোনক্রমেই পিছু হটে যাওয়া চলবে না। সকলে তৈরী হয়ে গেল। পার্শী রুস্তমজী—যাঁকে সবাই আদর ক'রে কাকাজী বলত, তিনি ফিনিক্সের বাইরে ছিলেন, তাঁকেও সব খুলে বললাম। ইনি আগের বারে জেলে গিয়েছিলেন, এবারেও যাবার জন্য তৈরী হলেন।

আমরা যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হ'ল। যে মেয়েরা ট্রান্সভালে গ্রেপ্তার হ'ল না, তারা নিরাশ হয়ে নাটালে গেল এবং কয়লাখনিতে কুলিদের ধর্মঘট সুরু করাল। এতে বিদ্যুতের মত কাজ হ'ল। সবাই কাজ ছেড়ে দিল, এবারে মেয়েদের গ্রেপ্তার ক'রে তিন তিন মাসের সাজা দেওয়া হ'ল।

দণ্ডিতা মেয়েদের মেরিৎসবার্গের জেলে রাখা হয়। সেখানে তাদের খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। তাদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে কেউ লক্ষ্য রাখত না, ধোপার কাজ দেওয়া হয়েছিল, বাইরে থেকে খাবার আনা ত বন্ধই ছিল। কস্তুরবা এক প্রকার বিশেষ খাদ্য খাবার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ অতি কষ্টে তা মঞ্জুর করলেন;

কিন্তু খাবার যা পাওয়া যেত তা প্রায় অখাদ্য। আপত্তি করলে জবাব মিলত, "এ হোটেল নয় যে যা খুশি পাওয়া যাবে।" যখন কস্তুরবা জেল থেকে বেরুলেন, তখন তাঁর হাড় ক'খানি মাত্র ছিল। অনেক কষ্টে তাঁকে বাঁচান হয়েছিল।

আর এক বোন ভয়ানক জ্বর নিয়ে বাইরে এসে কয়েকদিন পরেই মারা যায়। তার নাম ছিল বালি-আম্মা। কঙ্কালসার বালি-আম্মাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "জেলে যাওয়ার জন্যে আফসোস হচ্ছে না ত? সে উত্তর দিল,—"কেন হবে? আবার গ্রেপ্তার করে ত, আবার জেলে যাব।" "যদি সেখানে মরে যাও, তবে?" "ভালই হবে, দেশের জন্যে মরতে কার না সাধ হয়?" তার দেহ চলে গেছে, কিন্তু সে তার নাম অমর ক'রে গেছে।

এই বোনদের ত্যাগ ছিল শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। এদের আত্মদানে ভগবানের আসন ট'লে যায়।

অনেকের জেলে যাওয়ায় হয়ত কোন ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি শুদ্ধাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কখনো নিষ্ফল যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আর কারু আত্মবলির ফল ফলেছে কি-না জানি না, কিন্তু আমি বলতে পারি, বালি-আম্মার আত্মদান নিশ্চয়ই সফল হয়েছে।

হাজার হাজার লোকে দেশের ও জগতের জন্যে সত্যাগ্রহ করছে ও করবে, কিন্তু তন্মধ্যে যদি একজনও শুদ্ধাত্মা থাকে ত, তার যজ্ঞই ফললাভের পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সত্য বা সৎ মানে—যা আছে, অসত্য বা অসৎ মানে—যা নেই। কাজেই যা অসত্য—অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই, তার সফলতা হবে

কেমন ক'রে? আর যাতে সত্য আছে, তার নাশ কে করতে পারে? এরই মধ্যে সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিহিত আছে।

## সত্যাগ্রহে শ্রমিকদের অংশ

ভগিনীদের সত্যাগ্রহ দেখে নিউকাসলের কয়লাখনির মজুররা যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে দিল ও কাজ ছেড়ে দিল। তারা দলে দলে শহরে আসতে লাগল। আমি খবর পেয়ে নিউকাসলে গেলাম।

এই মজুরদের ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না। মালিকদের দেওয়া ঘর, আলো, জল ইত্যাদির উপর এদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'ত; এতে তারা মালিকদের সম্পূর্ণ অধীন থাকত। এই ধর্মঘটীরা আমার কাছে এসে নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা বলতে লাগল। যথা—খনির মালিকরা রাস্তার আলো সরিয়ে নিয়েছে, জল বন্ধ ক'রে দিয়েছে, ঘর থেকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ইত্যাদি। এক পাঠান ভাই পিঠ দেখিয়ে বলল, "দেখুন আমাকে কত মেরেছে। আপনার খাতিরেই বদমাসকে ছেড়ে দিয়েছি। কেন না এই আপনার হুকুম, না হ'লে আমি পাঠান, আর পাঠান কখনো মার খায়না, মার দেয়।" আমি বললাম, "ভাই, তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, তোমাদের শক্তিতেই আমি জিতব।"

হাজার হাজার সর্বহারা মজুর নিয়ে কোথায় রাখি, কি করি? স্থির করলাম, ট্রান্সভালে নিয়ে গেলে আইনভঙ্গ করাও হবে, আর এরা গ্রেপ্তারও হয়ে যাবে। ট্রান্সভালের সীমা প্রায় ৩৬ মাইল

দূরে। যারা পঙ্গু তারা ট্রেনে ও বাকী লোকেরা পায়ে হেঁটে যাবে স্থির হ'ল। নিউকাসলের গোরারা কলেরার ভয়ে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করল। যাত্রার জন্যে তৈরী হচ্ছিলাম, এমন সময় খনি-মালিকদের নিমন্ত্রণ পেয়ে ডারবানে গেলাম। তাদের সঙ্গে কোন মীমাংসাই হ'ল না। নিউকাসলে ফিরে গেলাম। স্রোতের জলের মত মজুররা এসে হাজির হচ্ছিল। তাদের কাছে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললাম, মালিকদের ধমকানি, ভবিষ্যতের বিপদ, জেল ইত্যাদির কথা। বললাম, "যারা কাজে ফিরে যেতে চাও, যেতে পার, কিন্তু একবার এগিয়ে গেলে আর ফেরার রাস্তা নেই।" তারা সঙ্কল্পে অটল রইল।

অবশেষে ১৯১৩ সালের ২৮শে অক্টোবর প্রত্যূষে যাত্রা সুরু করা স্থির হ'ল। ৫।৬ হাজার মজুর—এত লোককে আয়ত্তে রাখা সহজ নয়। তাদের বললাম, "রাস্তায় প্রত্যেকের রোজ পোয়া তিনেক রুটি ও কিছু চিনি ছাড়া আর কিছু মিলবে না, অবশ্য যদি ভারতীয় ব্যাপারীরা কিছু দেয় ত স্বতন্ত্র কথা। না হ'লে ওতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রয়োজনের বেশী কাপড়চোপড় নেওয়া চলবে না, রাস্তায় কারো জিনিসে হাত দেওয়া হবে না। মালিকরা বা গোরারা রাস্তায় যদি গাল দেয় বা মার দেয় ত তা সহ্য ক'রে নিতে হবে। পুলিস গ্রেপ্তার করতে এলে চুপচাপ ধরা দিতে হবে। আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেও এভাবে সবাইকে যেতে হবে।" আমার পরে এসে কারা কারা কাজের ভার নেবে—তাও ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল।

দলটি নিরাপদে চার্লসটাউনে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ব্যাপারীরা নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে দিল ও অন্যভাবে যথেষ্ট সাহায্য করল। শহরটি ছোট, মাত্র হাজার-খানেক লোকের বাস। এই ছোট জায়গায় এত লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। কিন্তু অধিবাসীদের সাহায্য এবং সহকর্মীদের চেষ্টায় বিশেষ কোন অসুবিধা হ'ল না। সব কাজে আমরা অগ্রণী হতাম। ঝাড়ু দেওয়া, মল-মূত্র সাফাই ইত্যাদি নিজেরাই আগে করতাম। ফলে অন্যেরা সহজে ঐসব কাজে যোগ দিত। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, নেতা যদি নিজে সব ক'রে দেখান, তা'হলে অনুগামী তাঁর অনুকরণ না ক'রে পারে না। আর নেতা চুপচাপ ব'সে থেকে হুকুম করলে কোন কাজই হয় না।

রান্না ও পরিবেশন দুই-ই আমি দেখাশুনো করতাম। খাদ্য কখনো কাঁচা থেকে যেত, কখনো বা ভাগে কম হ'ত। নিউকাসল থেকে মজুররা যখন-তখন দলে দলে এসে যেত। চব্বিশ ঘণ্টাই রান্না লেগে থাকত। মেয়েরা খাবার কম হ'লে কখনো কখনো তিরস্কারের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন, কিন্তু আমি আমার অসহায় অবস্থা বুঝিয়ে বললে হেসে উঠে যেতেন—এইরূপ কত বিচিত্র কথাই না মনে আসে।

## আমাদের অভিযান

চার্লসটাউনে থাকতে-থাকতেই আমি ট্রান্সভাল সরকারের নিকট লিখে জানাই যে, আমরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে চাই—

সেখানে স্থায়িভাবে থাকবার জন্যে নয়, সরকার যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন তার প্রতিবাদ করার জন্যে, আমাদের আত্মসম্মান-হানিতে দুঃখ প্রকাশ করাবার জন্যে। তাঁরা যদি চান ত আমাদের এখনই গ্রেপ্তার করতে পারেন, নতুবা আমরা যাত্রা সুরু করব। মাথা পিছু তিন পাউণ্ড কর তুলে নেওয়া হ'লে ত আমরা এখনই শ্রমিকদের কার্যস্থলে পাঠিয়ে দেব ইত্যাদি।

উত্তর আসতে খুব দেরী হ'তে লাগল দেখে আর প্রতীক্ষা না ক'রে যাত্রা সুরু করা স্থির করলাম। রোজ ২০ থেকে ২৪ মাইল ক'রে ৮ দিন চললে আমরা টলস্টয় আশ্রমে হাজির হব। সেখানে গেলে লড়াই না থামা পর্যন্ত সকলকে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। মিঃ কেলেমবেক সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। মজুররা কাজ ক'রেই জীবিকা অর্জন করবে, এই ছিল কথা।

যাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হ'ল। চার্লসটাউনের ডাক্তার আবশ্যকীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করলেন। পথে অন্য বহু লোকের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল গোরা। আমাদের স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ দেখে তাদেরও মনে সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছিল। বায়ুমণ্ডলে একটা পবিত্রতা বিরাজ করছিল। সকলে ভাবছিল— আমরা ইহুদী, পার্শী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সকলে পরস্পরের ভাই। এইভাবে যাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছিল, এমন সময় আর একবার মিটমাটের চেষ্টা করব ঠিক করলাম। আগেই তার করা হয়েছিল। এখন টেলিফোনে জেনারেল স্মাট্স্-এর সঙ্গে

কথা বলবার চেষ্টা করলাম। আধ মিনিটের মধ্যে উত্তর এল, 'জেনারেল স্মাট্‌স্ আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।' এই ব'লেই টেলিফোন বন্ধ হয়ে গেল।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, তবে অতটা কড়া ব্যবহার পাওয়ার আশা করিনি।

পরদিন ১৯১৩ সালের ৬ই নভেম্বর প্রত্যূষে ৬॥ টায় আমরা প্রার্থনা শেষ ক'রে ভগবানের নাম নিয়ে যাত্রা স্থরু করলাম। আমাদের সঙ্গে ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোকে ও ৫৭টি শিশু ছিল।

চার্লস্‌টাউন থেকে এক মাইল দূরে বোক্‌স্‌রস্টের ঝরণা। ঝরণা পার হ'লেই ট্রান্সভাল পড়ে। ঝরণার ওপারে অশ্বারোহী পুলিস দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম, তারা আমাকে গ্রেপ্তার করল না, সার বেঁধে জনতাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল; কিন্তু আমার অনুসরণকারীরা তাদের বাধা না মেনে এগিয়ে গেল। আমি তাদের শান্ত করলাম ও সার বেঁধে চলতে বললাম। ৫।৭ মিনিটের মধ্যে সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ট্রান্সভালের দিকে চলতে স্থরু করল।

বোক্‌স্‌রস্টের গোরারা ইতিমধ্যে সভা ক'রে ভারতীয়দিগকে ঠেকাবার জন্যে পরামর্শ করেছিল—আমাদের অনেক ধমকানি দিয়েছিল, এমন কি গুলি চালান হবে এমন কথাও বলেছিল। যাই হোক্, গোরারা কোন উপদ্রব করল না, মজা দেখবার জন্যে রাস্তায় জড় হ'ল।

আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল পামফোর্ডে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ৫টা। সকলে খাবার খেয়ে মুক্ত আকাশের নীচে বিশ্রাম করতে লাগল। কয়েকটি মেয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল। তাদের এক স্থানীয় ভারতীয় দোকানে রেখে দিলাম। কথা রইল যদি আমরা টলস্টয়ে পৌঁছতে পারি ত তাদের সেখানে পাঠান হবে, আর যদি আমরা গ্রেপ্তার হই ত তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গভীর রাত্রে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি—এমন সময় এক পুলিস অফিসার এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল। আমি তৈরীই ছিলাম, পার্শ্বে নিদ্রিত পি. কে. নাইডুকে জাগিয়ে আমার গ্রেপ্তারের খবর দিলাম। বললাম, "কাউকে এখন জাগিও না, সকালে যথা-নিয়মে সকলে পথ চলবে। যখন সবাই আহার ও বিশ্রাম করতে থাকবে—তখনই আমার গ্রেপ্তারের খবর দেবে; তার আগে যদি কেউ জানতে চায় ত তাকে বলতে পার। রাস্তায় যদি পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করে ত সে গ্রেপ্তার হয়ে যাবে, অপরে চলতে থাকবে।"

আমি পুলিসের সঙ্গে চললাম, বোক্‌স্‌রস্টের আদালতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সরকারী উকিল সময় চাইলেন, আমিও সঙ্গীদের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে আসব ব'লে জামিন চাইলাম। সরকারী উকিলের আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে ৫০ পাউণ্ডের জামিনে মুক্তি দেওয়া হ'ল। মিঃ কেলেমবেক আমার জন্যে মোটর তৈরী রেখেছিলেন। আমি দ্রুত সঙ্গীদের কাছে

উপস্থিত হ'য়ে তাদের নিয়ে অগ্রসর হলাম। আমাকে আবার স্ট্যাণ্ডার্ডটনে গ্রেপ্তার করা হ'ল। আদালতে গিয়ে আমার আরও কয়েকটি সাথীকে গ্রেপ্তার হ'তে দেখলাম। এখানেও আমি পূর্ববৎ জামিনে মুক্ত হলাম। গাড়ি তৈরী ছিল, আমাদের দল তিন মাইলও যায়নি, আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম ও এগিয়ে চললাম।

আমরা যতই সোৎসাহে অগ্রসর হচ্ছিলাম, সরকার পক্ষ ততই চিন্তিত হচ্ছিল। আমরা জোহান্সবার্গের কাছে এসে পড়েছিলাম, আর কিছুদূর গেলেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছব। এমন সময় আর একবার আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে বেলফোর্ড দিয়ে হিড্‌ল্‌বার্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ওদিকে দলটি মিঃ পোলকের পরিচালনায় অগ্রসর হ'তে লাগল। মিঃ পোলক আমার সঙ্গে একটি জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমাদের সঙ্গে এসে মিশেছিলেন। আমি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তিনি কাছেই ছিলেন। আমি তাঁর উপর দল পরিচালনার ভার দিয়েছিলাম।

দলটি যখন ১০ তারিখে সকালে বেলফোর্ডে এসে পৌঁছল, তখন তাদের নাটালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনটি স্পেশাল রেল গাড়ী তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকেরা প্রথমতঃ গ্রেপ্তার হ'তে চায় নি, কিন্তু মিঃ পোলক ইত্যাদি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করেছিলেন। তখন সকলে শান্তভাবে গাড়ীতে উঠে পড়েছিল।

## সত্যাগ্রহের জয়

আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে ডাণ্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মিঃ পোলক ও মিঃ কেলেমবেককে গ্রেপ্তার ক'রে বোক্স্‌রস্ট জেলে আবদ্ধ করা হয়। ডাণ্ডিতে ১১ই তারিখে আমার বিচার ক'রে ৯ মাসের সশ্রম কারাবাসের হুকুম দেওয়া হয়। তখনো বোকস্‌রস্টে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের ছিল। ১৩ই তারিখে আমাকে আবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। মিঃ পোলক ও মিঃ কেলেমবেকের সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। ১৪ই তারিখে আমাদের তিনজনকে তিন তিন মাস ক'রে জেল দেওয়া হয়।

জেলে আমরা মনের আনন্দেই ছিলাম। সেখানে হরবৎ সিংহ নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর বয়স ৭৫ বছরেরও বেশী। তিনি খনির কুলি ছিলেন না, আমার গ্রেপ্তারের সংবাদে অন্য অনেকের সঙ্গে কেবল উৎসাহের বশবর্তী হয়ে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,—"আপনি জেলে এসেছেন কেন? আপনার মত বৃদ্ধকে ত আমি জেলে আসতে বলিনি?" তিনি উত্তর দিলেন,—"আপনি স্ত্রীপুত্রসহ যদি আসতে পারেন ত আমি কি ক'রে প'ড়ে থাকব?" আমি বললাম,—"আপনি জেলের কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না, আপনার মুক্তির জন্যে চেষ্টা করব?" তিনি কিছুতে রাজী হলেন না, বরং জেলে মরবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করলেন। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ হ'ল। ১৯১৪ সালের

৫ই জানুয়ারি জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহের ইতিহাসে হরবৎ সিংহের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ট্রান্সভালযাত্রী ভারতীয়দের গ্রেপ্তার ক'রে নাটালে নিয়ে যাওয়া হ'ল ও জেলে রাখা হ'ল। খনির আশপাশ ঘিরে জেল তৈরী ক'রে সেখানে তাদের রাখা হয় এবং খনিতে কাজ করান হয়। এই গোলামির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হয়। গোখ্‌লে অসুস্থ হ'লেও এই সম্পর্কে খুব নাড়াচাড়া করেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন ক'রে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা ভারতে ও ইংলণ্ডে খুব আন্দোলিত হয় এর ফলে একটি কমিশন বসে। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারী গেজেটে ইণ্ডিয়ান রিলিফ বিল প্রকাশ করা হয়। এই বিল অনুসারে ৩ পাউণ্ড কর উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ভারতীয় বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নেওয়া বাধ্যতামূলক থাকে না।

এইভাবে দীর্ঘ ৮ বছরের পর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সফল হয় এবং ভারতীয়দের কিছুটা রেহাই মেলে। আমি ১৯১৪ সালের ১৮ই জুলাই স্বদেশযাত্রার পথে মিঃ গোখ্‌লের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইংলণ্ড যাত্রা করি। আমার মনে স্বদেশযাত্রার আনন্দ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগের নিরানন্দ—দুই-ই ছায়া ফেলেছিল।

## গোখ্‌লের সঙ্গে বিলাতে

সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গোখ্‌লের ইচ্ছানুসারে ইংলণ্ড হয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলাম, সঙ্গে কস্তুরবা ও মিঃ কেলেমবেক ছিলেন। জাহাজে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। আমার জন্য কর্তৃপক্ষ অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এইজন্যে আঠারো দিন সমুদ্র-যাত্রা করলেও বিশেষ কোনও কষ্ট হয়নি। এই যাত্রার কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা আছে। মিঃ কেলেমবেকের দূরবীণের খুব শখ ছিল। প্রায়ই সঙ্গে দু' একটা দামী দূরবীণ থাকত, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্কবিতর্ক হ'ত। অমি বলতাম, "আমরা যেভাবে জীবনযাপন করতে চাই, এরূপ দামী শৌখিন জিনিস রাখা তার প্রতিকূল।" একদিন তাঁকে বললাম,—"এই দূরবীণটা নিয়ে যখন এত ঝগড়া, তখন এটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিই না কেন?" তিনি অসঙ্কোচে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক ত! নিশ্চয়ই, আমার কোন আপত্তি নেই।" আমি তৎক্ষণাৎ দামী দূরবীণটা সমুদ্রে ফেলে দিলাম। মিঃ কেলেমবেকের সঙ্গে আমার কত বুঝাপড়াই না হ'ত!

ইংলিশ-প্রণালীতে পৌঁছেই খবর পেলাম, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। ৪ঠা আগস্ট যুদ্ধ-ঘোষণা হয়। আমরা ৬ই আগস্ট বিলেতে পৌঁছি।

বিলেতে পৌঁছে খবর পেলাম, গোখ্‌লে প্যারিসে থেকে গেছেন। প্যারিসে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। গোখ্‌লে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সেখানে আটকে

গেছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে আমার দেশে ফেরা সম্ভব নয়। এই সময় ভাবতে লাগলাম, যুদ্ধে আমার কর্তব্য কি?

আমার বন্ধু, যে-সব ভারতীয় ছাত্র বিলাতে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভা ডাকা হ'ল। সভায় আমি এই মন্তব্য প্রকাশ করলাম যে, বিলাতপ্রবাসীদের উচিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। ইংরেজ ছাত্রদের মত ভারতীয় ছাত্ররাও যুদ্ধে সাধ্যমত সাহায্য করবে। আমার এই মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখান হয়। বিরোধীরা বলেন, ইংরেজ ও ভারতীয়—উভয়ের স্বার্থ ত সমান নয়। একজন গোলাম, আর একজন হচ্ছে প্রভু। গোলাম স্বেচ্ছায় কিভাবে প্রভুকে সাহায্য করবে? বরং মুক্তিকামী গোলামের উচিত নয় কি যে, সে প্রভুর বিপদের সুযোগ নিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইবে? কিন্তু তখন এই যুক্তি আমার ভাল লাগেনি। আমি নিজেদের অবস্থা জেনেও মনে করতাম, ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি খুব খারাপ নয়। ব্যক্তিগতভাবে শাসকরাই খারাপ ব্যবহার করে, আর প্রেমের দ্বারা তাদের দোষ দূর করা যায়। আমার মনে হয়েছিল, যদি ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে আমরা নিজেদের উন্নতিসাধন করতে চাই, তাহ'লে ইংরেজদের বিপদের সময় আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা। ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতির সমস্ত গলদ সত্ত্বেও তখন উহা আমার নিকট তত অসহ্য মনে হয়নি। আজ আমার ইংরেজ-শাসনের উপর সকল আস্থা চ'লে গেছে। তখন যারা এইভাবে আস্থাহীন হয়েছিল, তারা আর কি ক'রে যুদ্ধে সাহায্য করবে? আমি কিন্তু তখন ইংরেজদের

বিপদের সময় আমাদের দাবি পেশ করবার পক্ষপাতী ছিলাম না, কাজেই স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্যে সবাইকে আমন্ত্রণ দিলাম, অনেক নাম পাওয়া গেল। প্রায় সব ধর্ম ও সব প্রদেশের লোকই নাম দিয়েছিল। গভর্নমেণ্টের কাছে আমরা লিখে জানালাম যে, আহতদের শুশ্রূষার জন্যে আমরা একটি দল তৈরী করেছি। গভর্নমেণ্ট তাতে রাজি হ'ল ও কৃতজ্ঞতা জানাল। স্বেচ্ছাসেবকরা আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করল। আমরা প্রায় আশীজন স্বেচ্ছাসেবক এই দলে ছিলাম। ছ সপ্তাহের পর পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাতে মাত্র একজন ফেল করে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের কুচকাওয়াজ শেখান হয়। কর্নেল ব্যাঙ্কার এই দলের নায়ক হন।

এই সময়কার বিলেতের দৃশ্য ভুলবার নয়, লোকের মনে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না, সকলে যথাশক্তি যুদ্ধে সাহায্য করতে উদ্যত ছিল। অক্ষম, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা সেলাই ইত্যাদির কাজ করছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই কাজে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এইভাবে আমি নিজের ধর্ম মনে ক'রে যুদ্ধে যোগ দিলাম ঠিক, কিন্তু এই সঙ্কটসময়েও সত্যাগ্রহ করবার আবশ্যক হয়েছিল।

বিলেতে আমার প্লুরিসি হয়। সেই সময় গোখ্‌লে বিলেতে এসে পৌঁছেন। মিঃ কেলেমবেক ও আমি তাঁর কাছে প্রায়ই যেতাম। যুদ্ধ সম্পর্কে নানা আলোচনা হ'ত; আমার অসুখ সম্পর্কেও হ'ত। আমি তখনও আহার সম্পর্কে

পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। প্রধানতঃ চীনাবাদাম, কলা, লেবু, জলপাই-এর তেল, টম্যাটো ইত্যাদি খেয়ে থাকতাম। দুধ, শাকসবজি, ডাল ইত্যাদি একেবারেই খেতাম না। জীবরাম মেহ্‌তা আমার দেখাশুনা করতেন। তিনি আমার এই আহারের বিরুদ্ধে গোখ্‌লের কাছে আপত্তি করেন। গোখ্‌লে আমার এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মত ছিল, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ডাক্তার যা খেতে বলবে তাই খাওয়া উচিত। তিনি আমাকে এ বিষয়ে খুব জিদ করতে লাগলেন। আমি বহু চিন্তার পর তাঁকে বললাম যে, ডাক্তারের পরামর্শমত অন্য সব খেতে পারি, কিন্তু দুধ ও মাংস কিছুতেই খাব না। অগত্যা তিনি এতেই রাজী হলেন। আমি প্রধানত ফলাহারের উপরই চলতে লাগলাম।

## স্বদেশ-যাত্রা

এই সময়ে গোখ্‌লে ভারতবর্ষে চলে গেলেন। আমিও সেখানে আর কিছুদিন থেকে ডাক্তারের পরামর্শমত দেশে যাবার জন্য তৈরী হলাম। মিঃ কেলেমবেকও আমার সঙ্গে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে আসতে হ'ল। এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করছেন।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে চাইলাম; কিন্তু পাওয়া গেল না। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট নিতে হ'ল।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা অনেক ফল এখনো ছিল। সে সব সঙ্গে নিলাম। রাস্তায় প্রধানতঃ ফলাহার ক'রেই থাকতাম। ডাঃ জীবরাম মেহতা বুকে যে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে একেবারে খুলতে বারণ করেছিলেন—সেটা ২।৩ দিন পরেই অসহ্য মনে হওয়ায় খুলে দিয়েছিলাম। সুয়েজ খালে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়ে গেল, বোধহয় সমশীতোষ্ণ আবহাওয়ার গুণে।

জাহাজে যেসব ইংরেজযাত্রী ছিল তাদের সঙ্গে মন খুলে মেশা যেত না। তারা দূরে দূরে থাকত, কারণ ভারতবর্ষ গোলামের দেশ এবং তারা সেই দেশ শাসন করতে যাচ্ছে,—এই মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে ছিল। এদিকে ভারতবাসীদের মধ্যেও, আমরা গোলাম—এই ভাব ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিলেত যাওয়ার সময় জাহাজে এমনটি হ'ত না, আন্তরিকভাবে মেলামেশা চলত।

এডেনে এসে মনে হ'ল বাড়ীর কাছে এসে গেছি। কয়েক দিনের মধ্যে বোম্বাইতে পৌঁছলাম। যেখানে ১৯০৫ সালে ফেরবার আশা করেছিলাম, সেখানে ১০ বছর পরে এসে খুব আনন্দ হ'ল। বোম্বাইতে গোখ্‌লে আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। শরীর ভাল না থাকলেও তিনি বোম্বাইতে এসে পৌঁছলেন। তাঁর কাছে আমার মাথার বোঝা নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বোম্বাইতে এলাম, কিন্তু বিধাতা অন্য ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন।

মানুষ এক ভাবে মনে, বিধাতা করেন আর।

## ভারতবর্ষে

(১) গোখ্‌লের সঙ্গে পুণায় ঃ—বোম্বাইতে আসার পর বোম্বাইয়ের গভর্নর গোখ্‌লের মারফত আমাকে ডেকে পাঠান। আমি দেখা করি। দু-চারটি কথার পর তিনি আমাকে বলেন যে, কোন আন্দোলন করবার আগে যেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ও পরামর্শ করি। আমি বললাম, "তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সত্যাগ্রহ করবার আগে আমি সর্বদা বিরোধীপক্ষের কথা তাঁর নিজের কাছ থেকে জেনে নিই এবং তাঁকে আমার অনুকূলে আনবার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করি।" লর্ড উইলিংডন আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর পুণায় গেলাম। গোখ্‌লে ও ভারত ভৃত্য-সমিতির সদস্যরা আমাকে প্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দিলেন। গোখ্‌লের ইচ্ছা ছিল, আমি সমিতির সদস্য হই। আমারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সমিতির অন্য সদস্যরা আশঙ্কা করলেন, হয়ত আমার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের আদর্শ মিলবে না। তাই সদস্য হওয়া গেল না। গোখ্‌লে কিন্তু আমাকে সর্বদা সদস্য হিসাবেই দেখতেন।

ফিনিক্স আশ্রমের সঙ্গীদের নিয়ে এখানে একটা আশ্রম স্থাপন করবার অত্যাবশ্যকতা অনুভব করলাম। তাঁদের কাছে আমার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলাম। নিজে গুজরাটী ব'লে গুজরাটে বসেই সেবাকার্য করা সমীচীন মনে হ'ল। গোখ্‌লেও তাই

পছন্দ করলেন। তিনি বললেন, "আশ্রম খোলা চাই-ই। তার জন্যে টাকাকড়ির ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। আমি ওকে নিজেরই আশ্রম মনে করব।" এতে আমার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি আমার প্রয়োজনমত টাকা পাওয়ার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এখন আমি পুণা থেকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্যে তৈরী হলাম। গোখ্‌লে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার বিদায়-সংবর্ধনায় যোগ দিতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর সেই মূর্ছা আমার উপর স্থায়ী দাগ রেখে গেছে।

(২) বিরাম-গাঁওয়ের শুল্ক ঃ—আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পোরবন্দর ও রাজকোটে যাওয়া আবশ্যক ছিল। এজন্যে রাজকোটে গেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহের সময় থেকে আমি নিজের বেশভূষা গিরমিটিয়া মজুরদের মত ক'রে ফেলেছিলাম।

ওয়ারোয়ান স্টেশনে সুপরিচিত জনসেবক দর্জি মতিলাল আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বিরামগাঁওয়ে যাত্রীদের নিকট শুল্ক আদায়ের জন্যে যেভাবে তল্লাস করা হ'ত, তার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান এবং আমাকে তার প্রতিকার করতে বলেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে জেলে যেতে প্রস্তুত। পরে কাথিয়াবাড়ে আমি যেখানে যেখানে গেলাম সেইখানেই ঐ অভিযোগের কথা শুনতে পেলাম। বিশেষভাবে

খোঁজ ক'রে আমি বুঝতে পারলাম, ঐ অভিযোগ সত্য। তখন বোম্বাই সরকারের কাছে এর প্রতিকার-প্রার্থী হলাম। কিন্তু তাতে কোন সুফল হ'ল না। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেতে বলেন। সুতরাং, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লেখালেখি করতে লাগলাম। তাতেও কোন ফল হ'ল না। ২।৩ বৎসর পরে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর কাছে সব কথা বলায় তিনি সমস্ত খবর নিয়ে শুল্ক তুলে দিলেন। এই জয়কে সত্যাগ্রহের ভিত্তি ব'লেই আমি মনে করি।

(৩) শান্তিনিকেতনে ঃ—রাজকোট থেকে আমি শান্তিনিকেতনে গেলাম। এখানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে কাকা কালেলকারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সেখানেই ছিলেন। মগনলাল গান্ধী আমাদের দেখাশুনো করতেন এবং ফিনিক্স আশ্রমের সমুদয় নিয়ম এখানেও চালিয়েছিলেন। 'শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমরা শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিশে দৈহিক শ্রম ও কাজ সম্বন্ধে চর্চা করতাম। নিজেদের সমস্ত কাজ নিজেরা ক'রে নিতাম, যথা বাসন মাজা, রান্না করা ইত্যাদি। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থাকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ গোখ্‌লের মৃত্যু-সংবাদে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। আমি পত্নী ও মগনলালকে নিয়ে পুণা যাত্রা করলাম। আর সকলেই শান্তিনিকেতনে থাকলেন। মিঃ এণ্ড্রুজ আমাকে বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর একটি

প্রশ্নের উত্তরে আমি জানালাম, "গোখ্‌লের কাছে আমি অঙ্গীকার রয়েছি যে, এক বৎসরকাল শুধু দেশে ঘুরে ফিরে সব খবর নেব, সক্রিয়ভাবে কিছু করব না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব হবে কি না তা বলা সম্ভব নয়।" এখানে বলা দরকার যে, মিঃ গোখ্‌লে আমার 'হিন্দ্‌ স্বরাজ্য' বইখানি প'ড়ে হেসে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে এক বছর থাকলেই তোমার এসব চিন্তা আপনা থেকেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

( ৪ ) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী :—বর্ধমানে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে হয়রানির একশেষ হ'ল। যদিও অনেক কষ্টে টিকিট পাওয়া গেল, গাড়িতে চড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ধাক্কাধাক্কি ঠেলা-ঠেলির ভেতর আমার মত দুর্বল লোকের স্থান কোথায়? অবশেষে মগনলালকে যেখানে হোক চড়তে ব'লে সস্ত্রীক মধ্যম শ্রেণীর গাড়িতে চড়লাম, এজন্যে আসানসোলে আমার কাছ থেকে অন্যায় ভাবে পুণা পর্যন্ত দেড়গুণ ভাড়া আদায় ক'রে নেওয়া হয়। পরে উপরওয়ালাদের নিকট অনেক লেখালেখি ক'রে অতিরিক্ত ভাড়া আংশিকভাবে ফেরত পাওয়া যায়। এই সময় ও তৎপরেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যে দুর্দশা দেখেছি, তা ভুলবার নয়! আমি সর্বদা তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে ইচ্ছুক হ'লেও পরে স্বাস্থ্যহানির জন্যে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হয়। রেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও অব্যবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও যাত্রীদের অজ্ঞতা, নোংরামি, স্বার্থপরতা ইত্যাদির অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট হয়েছে। তাদের পক্ষে এসব অভ্যাসগত হয়ে গেছে। কোন সংস্কার তারা মানতে চায় না।

(৫) আমার চেষ্টাচরিত্র ঃ—পুণায় পৌঁছে গোখ্‌লের শেষ-কৃত্যাদিতে যোগ দিলাম। পরে ভাবতে লাগলাম, এখন আমার কর্তব্য কি? ভারতভৃত্য সমিতিতে ঢুকব কি না? গোখ্‌লে যতদিন ছিলেন, ততদিন সমিতির সদস্য হওয়ার এমন কিছু দরকার ছিল না। আমি ত গোখ্‌লেকে নিজের অভিভাবকের মত দেখতাম এবং তাঁরই পরিচালনায় ভারতের বিক্ষুব্ধ রাজনীতি-সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া ভাল মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন? এখন সমিতির সদস্য হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে হ'ল। সেজন্যে আমার সম্পর্কে কোনরূপ শঙ্কা পোষণ না ক'রে আমাকে সদস্যরূপে নেওয়ার জন্য সমিতির সদস্যদের অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। তাঁদের সকলের আমার প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও একদল আমার সদস্য হওয়ার পক্ষে এবং একদল বিপক্ষে রায় দিলেন। সেদিন কোন সিদ্ধান্ত হ'ল না। আমরা যে-যার বাসস্থানে গেলাম। আমার মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠল। ভাবলাম, এভাবে অধিকাংশের মতে সমিতিতে প্রবেশ করলে গোখ্‌লের ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি? যতক্ষণ সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ আছে, ততক্ষণ আমার সদস্য হওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত নয় কি? এই কথা মনে হওয়ামাত্র শাস্ত্রীজীর কাছে আর সভা ডাকতে নিষেধ ক'রে পত্র দিলাম। এর ফল পরিণামে খুব ভালই হয়েছিল। আমি সদস্য না হ'লেও সমিতির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। সমিতিও আমার তীর্থক্ষেত্র হয়ে আছে।

(৬) সত্যাগ্রহাশ্রম স্থাপন :—১৯১৫ সালের ২৫শে মে আশ্রম স্থাপন করা হয়। অনেকে অনেক জায়গার নাম করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেদাবাদে আশ্রম করাই স্থির করি। আমি স্বয়ং গুজরাটী, সুতরাং গুজরাটী ভাষার সাহায্যে সেবা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আমেদাবাদ ধনিকপ্রধান স্থান। তাই অর্থসাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। সুতরাং চরকা চালাবারও সুবিধা হবে, ইত্যাদি নানা কারণে আমেদাবাদ নির্বাচন করা হয়েছিল।

একটি বাড়ি ভাড়ায় নেওয়া হ'ল। আশ্রমের নাম রাখা সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রস্তাব দিলেন। আমি ও সঙ্গীরা 'সত্যাগ্রহাশ্রম' নাম রাখাই ভাল মনে করলাম। কারণ তাতে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা ত বিশেষ-ভাবে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করবার জন্যেই আশ্রম স্থাপন করতে চেয়েছিলাম।

আশ্রমের একটা নিয়মাবলী তৈরী ক'রে বহুস্থানে পাঠান হ'ল ও মত লওয়া হ'ল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নম্রতার উপর খুব জোর দেন। আশ্রমের বাসিন্দারা একই পরিবারভুক্ত লোকের মত বাস করতে লাগল।

(৭) কষ্টিপাথরে :—কয়েকমাস আশ্রমস্থাপনের পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠক্কর (ঠক্কর বাপা) একজন অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। তাঁর নাম দুধাভাই। তিনি আশ্রমের নিয়মাবলী পালন করতে প্রস্তুত আছেন

জেনে তাঁকে আশ্রমে নিতে রাজী হ'লাম। দুধাভাই সপরিবারে আশ্রমে এসে গেলেন, তিনি বোম্বাইয়ে শিক্ষকতা করতেন।

এখন আশ্রমের সাহায্যকারীদের মধ্যে খুব আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। বাড়ীর কূয়া ব্যবহার সম্পর্কে আপত্তি উঠল। গালি-গালাজ সুরু হ'ল। দুধাভাইকেও ধমক দেওয়া হ'ল। আমরা সব নীরবে সহ্য ক'রে জল নিতে লাগলাম। তাতে গালি-গালাজ বন্ধ হ'ল। সেই সঙ্গে আর্থিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেল। আশ্রম স্থাপনের প্রথম থেকেই কয়েকজন সাহায্যদাতা অস্পৃশ্যদের স্থান দেওয়ার সপক্ষে ছিলেন না। তাঁরাই এখন গোলযোগ সুরু করলেন।

অর্থসাহায্য বন্ধ হ'ল। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, এমন খবরও আসতে লাগল। একদিন মগনলাল বললেন যে, আগামী মাসের খরচের জন্যে হাতে কিছু নেই। আমি তাই শুনে হরিজন মহল্লায় আশ্রম নিয়ে গিয়ে দৈহিক শ্রম ক'রে খরচ চালাবার মন্তব্য করলাম। ঠিক এই দুঃসময়ে একদিন এক ধনী ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশেষ কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই আশ্রমের ভেতর পর্যন্ত না এসে আশ্রম পরিচালনার জন্যে তের হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে গেলেন। আমার জীবনে এরকম আরো অনেকবার ঘটেছে; একেবারে নিঃসম্বল হয়ে গেছি, 'শ্যামলিয়া' কোথা থেকে সব জুটিয়ে দিয়েছে।

বাইরের মত ভেতরেও গোলমাল সুরু হ'ল, স্ত্রী ও অন্যান্য মেয়েরা অস্পৃশ্যদের আশ্রমে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না, দুধাভাই ও তাঁর

স্ত্রী খুব সহ্য করতে পারতেন, তাঁদের আচরণ ভালই লাগছিল, আমিও তাঁদের সহিষ্ণু হ'তে পরামর্শ দিলাম।

এই অবস্থার পরেও আশ্রমের খরচ বেড়েই চলল এবং সে টাকা হিন্দুদের কাছ থেকেই আসতে লাগল, এতে প্রমাণ হ'ল যে অস্পৃশ্যতার মূল শিথিল হয়ে গেছে।

(৮) গিরমিট প্রথা :—এখন আশ্রমের কথা ছেড়ে অন্য কথায় যাই। ভারতবর্ষে থেকে ৫ বছর পর্যন্ত মেয়াদের চুক্তিতে যেসব কুলিকে ভারতের বাইরে পাঠান হ'ত তাদের নাম ছিল গিরমিটিয়া। নাটালে তাদের উপর মাথাপিছু ৩ পাউণ্ড কর ধার্য হয়েছিল। ১৯১৪ সালে তা উঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথা বজায় থাকে। ১৯১৬ সালে পণ্ডিত মালব্য ঐ প্রথা উঠাবার জন্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন তুলেন। তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ 'সময় এলে উঠিয়ে দেওয়া হবে' বলে ভরসা দেন। আমার কিন্তু মনে হ'ল যে, আর এক মুহূর্তও একে চলতে দেওয়া উচিত নয়। লোকমতও তার অনুকূলে ছিল। এবিষয়ে কিভাবে সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায়, তাই আমার চিন্তার বিষয় হ'ল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মালব্যজী এই প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য একটি বিল আনতে চাইলেন। কিন্তু বড়লাট নামঞ্জুর ক'রে দিলেন। আমি এ বিষয় নিয়ে ভ্রমণ সুরু করলাম। বোম্বাইয়ে আহূত একটি সভায় প্রস্তাব দেওয়া হ'ল যে, ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে এই প্রথা রদ ক'রে দিতে হবে। সংবাদপত্রে এই ঘোষণা করা হ'ল।

আমি ভ্রমণ সুরু করলাম। ভ্রমণের সময় কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই

না হ'ত। গোয়েন্দারা সর্বদা পেছনে লেগে থাকত। যখন তখন বিরক্ত করত। তবে ওদের আমি কষ্ট দিতাম না, তারাও আমাকে কষ্ট দিত না। সৌভাগ্যবশতঃ তখন মহাত্মার ছাপ আমার গায়ে পড়েনি।

করাচী থেকে লাহোর হয়ে কলকাতায় যাই। পথে আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কলকাতায় কাশিমবাজারের মহারাজা আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলেন। সেখানকার সভায়ও তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভার লোকেরা গিরমিট প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে খুব উৎসাহ দেখান।

৩১শে জুলাইয়ের আগেই গিরমিট প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ'ল। আমি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে দরখাস্ত লিখি। এতদিনে বহুজনের বহু চেষ্টায় এই প্রথা উঠে গেল। এবারে শুধু সত্যাগ্রহ প্রয়োগের জন্যেই এর দ্রুত অবসান ঘটল।

(৯) চম্পারণ সত্যাগ্রহ :—চম্পারণের চাষীদের মালিকদের জন্যে প্রতি বিঘায় ৩ কাঠা জমিতে নীলের চাষ করতে হ'ত। নীলকুঠির সাহেবরাই ছিল জমির মালিক। এই প্রথার নাম ছিল 'তিন-কাঠিয়া'। চম্পারণে যাওয়ার আগে সেখানকার নীলচাষ বা কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। রাজকুমার শুক্ল নামক এক কৃষক নিজে নীলচাষের জন্যে অনেক দুঃখভোগ করে। পরে সে এই নীলচাষ তুলে দেওয়ার জন্যে কোমর বাঁধে। আমি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গেলে এই কৃষক আমাকে ধ'রে

বসল যে, আমাকে চম্পারণে যেতে হবে। সে বিহারের জনসেবার প্রাণস্বরূপ উকিল ব্রজকিশোরবাবুকে আমার কাছে নিয়ে এল। আমি তখন ভেবেছিলাম, এই উকিলটি বোধ হয় গরীব কৃষকদের ঘাড় ভাঙবার মতলবে আছেন! আমি বললাম, "নিজে গিয়ে না দেখা পর্যন্ত আমি কোন মত দিতে পারি না। আপনি কংগ্রেসে এই কথা তুলতে পারেন।" তিনি কংগ্রেসে এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন এবং সহানুভূতিসূচক একটি প্রস্তাব পাস হ'ল। রাজকুমার আমাকে চম্পারণে যাবার জন্যে জিদ করায় আমি দুয়েক দিনের জন্য যেতে রাজী হলাম।

লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুরে গেলাম। সেখানেও রাজকুমার ধাওয়া করল। আবার চম্পারণে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। পরে সে আশ্রমে গিয়ে আর একবার প্রতিশ্রুতি আদায় করল। তখন তাকে কলকাতায় দেখা করার নির্দিষ্ট তারিখ দিলাম। আমি কলকাতায় না পৌঁছতেই সে সেখানে হাজির। এবারে ঐ নিরক্ষর, গেঁয়ো অথচ দৃঢ়সঙ্কল্প কৃষকটি আমাকে জয় ক'রে নিল।

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে তার সঙ্গে আমি পাটনায় গেলাম। রাজকুমার আমাকে রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ি নিয়ে গেল, রাজেন্দ্রবাবু বাড়ি ছিলেন না, পুরী বা অন্য কোথাও গিয়েছিলেন।

আমরা পাটনা থেকে মজঃফরপুরে গেলাম। এই সময় সেখানে আচার্য কৃপালনী ছিলেন। আমি যখন হায়দরাবাদে যাই তখন ডাঃ চৈথরামের কাছে তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনি। উনি কিছু আগে মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আমি তাঁর

কাছে তার পাঠালাম। তিনি সশিষ্য অর্ধরাত্রে মজঃফরপুর স্টেশনে আমার সম্বর্ধনা করলেন। তিনি নিজে অধ্যাপক মালকানীর বাড়িতে থাকতেন, সেখানেই আমাকে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে রাজেন্দ্রবাবু ও ব্রজকিশোরবাবু এসে পৌঁছলেন। এবার ব্রজকিশোরবাবুর মধ্যে সরলতা, নম্রতা, সততা ও অসাধারণ শ্রদ্ধা দেখে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁর প্রতি বিহারের উকিলদের সমাদর দেখে আমার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না, সেদিন থেকে এই উকিল-মণ্ডলের সঙ্গে আমি জীবনব্যাপী স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি।

ব্রজকিশোরবাবুর কাছে সব খবর পেলাম। উনি গরীব কৃষকদের পক্ষ সমর্থন ক'রে মোকদ্দমা চালাতেন। ত্যাগী হ'লেও সংসার-খরচ চালাবার জন্যে ব্রজকিশোরবাবু ও রাজেন্দ্রবাবু উকিলের ফীস্ নিতেন। কিন্তু বাংলা ও বিহারের উকিলদের ফীসের পরিমাণ শুনে আমার তাক লেগে গেল, হাজারের কমে কেউ কথা বলতেন না। আমি এই বন্ধুদের একটু মিষ্টি তিরস্কার শুনালাম। তাঁরা তার উল্টো অর্থ করেন নি।

আমি তাঁদের এইসব মোকদ্দমা চালানো বন্ধ করতে পরামর্শ দিলাম। বললাম, "এতে কিছু লাভ হবে না, কৃষকদের ভয় দূর করা ও মনে সাহস দেওয়াই প্রধান কথা। আমি এখন মাত্র দু দিনের জন্যে দেখতে এসেছি, কিন্তু এতে দুবছরও লাগতে পারে। আমার কর্তব্য সুস্পষ্ট। তবে আমি আপনাদের সাহায্য চাই।" ব্রজকিশোরবাবু বললেন, "আমরা সবাই আপনার কথামত কাজ

করতে প্রস্তুত আছি। আপনার যখন যাকে দরকার পাবেন। জেলে-যাওয়াটা অবশ্য আমাদের পক্ষে নূতন। তবে সেজন্যেও চেষ্টা করব।”

কিষাণদের খবর নেওয়ার আগে নীলকুঠি সমিতির সম্পাদক ও কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সমিতির সম্পাদক পরিষ্কার বললেন, “আপনি বাইরের লোক, এ ব্যাপারে হাত দেবেন না।” আমি সবিনয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, “না, এতে হাত দেওয়ায় আমার পুরো অধিকার আছে।”

কমিশনার সাহেব ত আমাকে ধমক দেওয়া স্থরু করলেন এবং সরাসরি ত্রিহুত বিভাগ ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। আমি বুঝলাম, আমাকে তদন্ত করতে দেওয়া সরকারের ইচ্ছা নয় এবং হয়ত শীঘ্রই জেলে ঢুকতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মতি-হারীতে বা বেতিয়ায় গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যে যাত্রা করলাম। রাস্তায় পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সেপাই আমাকে চম্পারণ ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দিল। আমাকে নোটিশে স্বাক্ষর করতে বলায় আমি লিখে দিলাম যে, আমি চম্পারণ ছেড়ে যেতে চাই না। আমাকে মফঃস্বলে গিয়ে তদন্ত করতে হবে। এই হুকুম অমান্য করবার অপরাধে পরদিন আদালতে হাজির হওয়ার সমন পেলাম।

আমি জেলে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম। ব্রজকিশোর-বাবুকে এর পর কি করা উচিত সব বুঝিয়ে দিলাম।

আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা স্থরু হ'ল। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই মামলা গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধেই ছিল। কারণ কমিশনার

আমার জন্যে যে জাল বিস্তার করেছিলেন তাতে সরকারকেই পড়তে হ'ল। সরকারী উকিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সময় চাইলেন। আমি বললাম, "তার কোনও দরকার নেই। আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করছি।" এই ব'লে একটি ছোট বিবৃতি পাঠ করলাম। তাতে আমার চম্পারণে আসবার উদ্দেশ্য যে রাষ্ট্রের সেবা ও মানবসেবা ছাড়া আর কিছু নয় এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'লে আমার পক্ষে স্বেচ্ছায় চম্পারণ ত্যাগ যে অসম্ভব, তা খোলসা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে আইন-ভঙ্গের সাজা নিতে যে আমি প্রস্তুত, তাও বলা হয়েছিল। এই বিবৃতি দেওয়ার পর মামলা মুলতুবী রাখবার কোন কারণ ছিল না। তবু সেদিন রায়দান স্থগিত থাকল।

আমি বড়লাট, পণ্ডিত মালব্য ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির কাছে তার ক'রে সব জানিয়েছিলাম। মামলার রায় শোনাবার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট আমার কাছে খবর পাঠালেন যে, লাটসাহেবের ইচ্ছানুসারে আমার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে, আমি যেমন ইচ্ছা তদন্তকার্য চালাতে পারি এবং সেজন্যে সরকারী সাহায্যও পেতে পারি।

সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চম্পারণে কংগ্রেসের নাম না দিয়ে কাজ করাই ভাল মনে হয়েছিল, তখন সেখানে কংগ্রেস জনপ্রিয় ছিল না। তৎসত্ত্বেও সেখানকার লোকগুলিকে দেখে আমার পুরাতন বন্ধু ব'লে মনে হয়েছিল। আমি সত্যসত্যই এখানে যেন ভগবানের অহিংসার ও সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

চম্পারণে কৃষকদের ইতিহাস ও তদন্তের বিবরণ এখানে দেওয়ার স্থান নেই।* তদন্তকার্যের জন্যে কিষাণদের কাছ থেকে টাকা তোলা হয় নি। বোম্বাই থেকে বন্ধুরা পনের হাজার টাকা পাঠাবেন ব'লে তার করেন; কিন্তু আমরা খুব সংক্ষেপে কাজকর্ম চালাই, সেজন্যে দু-তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হয়নি।

মনে আছে, যত টাকা জোগাড় হয়েছিল, তা থেকে খরচ বাদে ৫০০৲ বা ১০০০৲ টাকা বাঁচান হয়েছিল।

উকিলবাবুরা প্রত্যেকে পাচক ও চাকর রেখে পৃথক্ পৃথক্ রান্নায় খেতেন। আমার তা ভাল লাগত না, আমি তাই তাঁদের তিরস্কার করতাম। শেষে চাকরদের বিদায় দিয়ে একসঙ্গে রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। সকলে একত্র নিরামিষ আহার করতে লাগলেন। এতে খরচ, সময় ও কর্মশক্তি ঢের বেঁচে গেল।

কিষাণদের জবানবন্দী নেওয়া হ'তে লাগল। ৫।৭ জন লোক সারাদিন খেটেও কাজ শেষ করতে পারত না। সম্পূর্ণ সঠিক বিবরণ ছাড়া অন্য কিছু নেওয়া হ'ত না। বিবৃতি নেওয়ার সময় আমাদের সম্মতিক্রমে গোয়েন্দা-পুলিস হাজির থাকত। কাজেই অত্যুক্তির কোন ভয় ছিল না। বিবৃতি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলকর সাহেবদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। আমাদের কাছে হাজার হাজার কিষাণের এইভাবে বিবৃতি

* বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ-কৃত 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ' নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দেওয়া তাদের বেশী চক্ষুশূল হয়ে উঠল। তারা তদন্ত বন্ধ করবার জন্যে ক্রমেই অধিক চেষ্টা করতে লাগল। একদিন বিহার সরকারের এক চিঠি পেলাম। তাতে বলা হয়েছিল, আমি যেন শীঘ্র তদন্ত শেষ ক'রে বিহার ত্যাগ করি। আমি উত্তর দিলাম, "তদন্ত শেষ করতে আরও দেরী লাগবে। তাছাড়া আমি ত তদন্ত ক'রেই ক্ষান্ত হব না, প্রজাদের যতদিন না দুঃখ দূর হয়, ততদিন এখানে থাকব।" অতঃপর লাটসাহেব আমাকে ডেকে বললেন যে, সরকার তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত করতে প্রস্তুত আছেন এবং আমাকে তার একজন সদস্য হ'তে হবে। আমি এই শর্তে রাজী হলাম যে, বন্ধুদের সঙ্গে আবশ্যকমত পরামর্শ করতে পারব এবং কিষাণদের পক্ষ সমর্থন করতে আমার কোন বাধা থাকবে না, আর তদন্ত সন্তোষজনক না হ'লে কিষাণদের পরিচালনা করবার স্বাধীনতা আমার থাকবে। লাটসাহেব সব স্বীকার ক'রে নিলেন।

তদন্ত-সমিতি কিষাণদের সমস্ত অভিযোগ সত্য ব'লে স্বীকার করল এবং সুপারিশ করল যে, নীলকর সাহেবরা অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ কিষাণদের ফিরিয়ে দেবে এবং 'তিন-কাঠিয়া' প্রথা উঠে যাবে। এইভাবে শত বৎসরের পুরাতন এই কুপ্রথা উঠে গেল এবং নীলকর সাহেবদের রাজত্ব শেষ হ'ল। এই ব্যাপারে ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড গেটের অকৃত্রিম সাহায্য ও দৃঢ়তা খুবই প্রশংসনীয়।

(১০) শ্রমিকদের সঙ্গেঃ—আমেদাবাদের শ্রমিকদের বেতন ছিল খুব কম, সেজন্যে শ্রীমতী অনসূয়া বাঈ তাদের পক্ষ সমর্থনের

জন্যে আমাকে লেখেন, আমি আমেদাবাদে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, মজুরদের অভিযোগ সত্য। আমি মালিকদের কাছে প্রস্তাব দিলাম যে পঞ্চায়েতের সাহায্যে যেন মিটমাট করা হয় কিন্তু তাঁরা এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন না। আমি তখন শ্রমিকদের নিম্নলিখিত শর্তে হরতাল করতে পরামর্শ দিলাম। (১) শান্তিভঙ্গ করা নিষিদ্ধ, (২) যে হরতাল করবে না, তার উপর জোরজুলুম নিষিদ্ধ, (৩) শ্রমিকরা ভিক্ষার অন্ন খাবে না, (৪) যতদিন হরতাল চলবে ততদিন দৃঢ় থাকতে হবে এবং পয়সার অভাব হ'লে অন্য কাজ ক'রে খাওয়া-পরা চালাতে হবে।

শ্রমিকরা এইসব শর্ত স্বীকার ক'রে নিয়ে হরতাল সুরু করল, শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও শোভাযাত্রা ক'রে মজুরদের প্রতিজ্ঞা ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। দু' সপ্তাহ পর্যন্ত তাদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল, পরে উৎসাহের স্রোতে ভাঁটা পড়তে লাগল। অনেকে কাজে ফিরে যেতে উদ্যত হ'ল, কর্মরত শ্রমিকদের উপর উৎপীড়নও সুরু হ'ল। আমি নিরুপায় হয়ে অনশন আরম্ভ করলাম। স্থির করলাম, মীমাংসা হওয়ার আগেই যদি শ্রমিকরা কাজে যায় ত আমি অনশন করতে থাকব। এতে শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ ফিরে এল; কিন্তু আমি অনশন চালিয়ে গেলাম, মিল-মালিকদের উপর এর প্রভাব পড়ল। তাঁরা মীমাংসার পথ খুঁজতে লাগলেন; শেষে তিন সপ্তাহ হরতাল চলবার পর একটা সন্তোষজনক মিটমাট হ'ল। আমাকে মাত্র তিনদিন উপবাস করতে হয়েছিল। হরতালের সময় আমরা শ্রমিকদের কাজ দিয়েছিলাম;

তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে সব কাজ করত। এই হরতালে বল্লভভাই প্যাটেল, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ও অনসূয়া বাঈ-এর যথেষ্ট দান ছিল।

(১১) রাউলাট আইন ও সত্যাগ্রহ ঃ—খেড়ার কৃষকদের কষ্ট দূর করার জন্যে একবার সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালাতে হয়, তার ফলও সন্তোষজনক হয়েছিল। সরকার কৃষকদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন।* এই সত্যাগ্রহের পর বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড আমাকে যুদ্ধে সহায়তা করতে বলেন। আমি অনেক বিচার-বিবেচনার পর সম্মত হই। যে সরকার আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে এবং যার দায়িত্ব আমরা নিতে চাই, বিপদে তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য—আমি সৈন্যসংগ্রহ স্থরু করলাম। কিষাণদের অনেকে সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে লাগল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে, আমাকেও অসুস্থতার জন্যে অন্যত্র যেতে হ'ল। সপ্তাহখানেক বায়ুপরিবর্তনের পর একটু সুস্থ হয়ে ফিরে এলাম। এই সময় ডাঃ দালাল আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁর আগ্রহে এবং সত্যাগ্রহের জন্যে বেঁচে থাকার লোভে নিজের প্রতিজ্ঞা কার্যতঃ ভঙ্গ ক'রেও ছাগলের দুধ খাওয়া স্বীকার ক'রে নিলাম। ফুঁকা দিয়ে গাই দোওয়া হয় ব'লে গাইয়ের দুধ খাওয়া কিছুতেই চলল না; কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার মূল কথা এই ছিল যে, পশুর দুধমাত্রই মানুষের নিষিদ্ধ খাদ্য। এখনও সর্বদা মনে হয়, ছাগলের দুধও ছেড়ে দেওয়া উচিত।

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ডাঃ দালালের চিকিৎসায় কিছুটা সেরে উঠার পর রাউলাট কমিটির রিপোর্ট দেখতে পাই, দেখে চমকে উঠলাম। আমেদাবাদে গিয়ে বল্লভভাইকে বললাম, "এর জন্যেও কিছু করা দরকার। এই রিপোর্ট কার্যে পরিণত হ'লে তার ধারাগুলি অমান্য করতে প্রস্তুত, এমন কিছু লোক নিয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে হবে।" প্রায় ২০ জনের একটি ছোট সভা ডাকা হয়, একটা প্রতিজ্ঞাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করলেন। সত্যাগ্রহ চালাবার মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না ব'লে প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের কিছু লোককে নিয়ে সত্যাগ্রহ-সভা স্থাপন করা হ'ল,—আমাকে সভাপতি করা হ'ল। সভার শিক্ষিত সদস্যদের অনেকে আমার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত ছিলেন না, সত্য ও অহিংসা সকলের প্রিয় ছিল না, তবু গোড়ার দিকে এই কাজ খুব জোরের সঙ্গেই চলেছিল।

একদিকে যেমন রাউলাট বিলের তীব্র প্রতিবাদ চলতে লাগল, অপরদিকে তেমনই সরকার-পক্ষ থেকে ঐ বিল কার্যে পরিণত করবার জন্য খুব তোড়জোড়ও চলতে লাগল। বিলটিকে আইনসভায় পাস করিয়ে নেওয়ার অভিনয় হ'ল। আমি এক দিন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। শাস্ত্রীজী খুব জোরাল ভাষায় বিলের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয়, তার কানে ঢোল বাজালেও সে জাগে না। শাস্ত্রীজীর প্রতিবাদ ব্যর্থ হ'ল। আমি বড়লাটের কাছে খোলা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে, "এই আইন কার্যে পরিণত হ'লে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ করতে বাধ্য হব।" কিন্তু সবই নিষ্ফল হ'ল। আমার শরীর

তখনও খুব দুর্বল ছিল, দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারতাম না, দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সারা শরীর কাঁপত, তবু খুব দীর্ঘভ্রমণ সুরু করলাম। মাদ্রাজ থেকে কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মাদ্রাজীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তার সুযোগ নেওয়া স্থির করলাম। মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আমার মনের উপর গভীর ছাপ রাখলেন, তাঁর সঙ্গে আন্দোলন সম্পর্কে নিরন্তর আলোচনা হ'ত। নেতাদের একটি ছোট সভা হ'ল। বিজয় রাঘবাচারী বললেন, সত্যাগ্রহের নীতি সম্পর্কে সব কথা তন্ন তন্ন ক'রে লিখে প্রকাশ করা উচিত। আমি বললাম, এ কাজ আমার সাধ্যাতীত।

ইতিমধ্যে বিলটি গেজেটে বের হ'ল ( ১৮ই মার্চ )। ঐদিন রাত্রে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমার মনে হ'ল, এই বিলকে উপলক্ষ ক'রে সমস্ত দেশে হরতাল করতে হবে। ঐদিন সকলে উপবাস ক'রে আত্মশুদ্ধি করবে ও কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। সকালে এই কথা শুনে রাজাগোপালজী সমর্থন করলেন। অন্যান্য বন্ধুরাও সায় দিলেন। প্রথমতঃ ৩০শে মার্চ দিন স্থির হ'ল ; কিন্তু পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল দিন ধার্য ক'রে ঘোষণা প্রকাশ করা হ'ল।

অল্প সময়ের মধ্যে কি ক'রে সমস্ত দেশ তৈরী হয়ে গেল কে জানে! মাদ্রাজ থেকে ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাইয়ে গেলাম। এর আগে ৬ই এপ্রিলের খবর দেরিতে পাওয়ায় ৩০শে মার্চ দিল্লীতে হরতাল

হ'য়ে গিয়েছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও হাকিম আজমল খাঁ তখন দিল্লীর জননায়ক। দিল্লীতে যেমন হরতাল হ'ল, তেমন হরতাল ইতিপূর্বে কখন দেখা যায় নি। হিন্দু-মুসলমান যেন মনেপ্রাণে এক হয়ে গেল। জুম্মা মসজিদে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হ'ল। শোভাযাত্রা দিল্লী স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় পুলিস বাধা দিল ও গুলি চালাল—কিছু লোক হতাহত হ'ল। দিল্লীর মত ঘটনা লাহোর এবং অমৃতসরেও ঘটল। অমৃতসর থেকে ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলু আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বোম্বাইয়ে হরতাল হয়ে যাওয়ার পর দিল্লী হয়ে অমৃতসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালাম।

৬ই এপ্রিল সকালে বোম্বাইয়ে হাজার হাজার লোক সমুদ্রস্নান শেষ ক'রে শোভাযাত্রা বের করল। অগণিত হিন্দু-মুসলমান সকলে এক মসজিদে সমবেত হ'ল। সেখানে আমাকে ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে বক্তৃতা দিতে হয়। সন্ধ্যার পর নিষিদ্ধ বই বিক্রি করে আইন ভঙ্গ করা হবে স্থির হ'ল। লবণ আইন ভঙ্গ করবারও নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যার পর স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আমি ও সরোজিনী দেবী নিষিদ্ধ বই বিক্রি করতে বেরোলাম। আমারই লেখা 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' ও 'সর্বোদয়' এই দুখানি বই বহুসংখ্যক ছাপিয়ে বিক্রি করা হচ্ছিল। প্রতি বইয়ের দাম মাত্র চার আনা করা হয়েছিল। কিন্তু লোকে দাম দেওয়ার সময় নির্বিচারে যার পকেটে যা ছিল তাই দিয়েছিল, একটা বই ৫০৲ টাকায় বিক্রি হ'ল। বিক্রয়লব্ধ সব টাকা আন্দোলনে খরচ করা হয়। এই আইনভঙ্গে

সরকার কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁরা বললেন, বইগুলির যে সংস্করণ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, সে সংস্করণ ত বিক্রি করা হয়নি। কাজেই প্রকৃতপক্ষে আইনভঙ্গ হয়নি। পরদিন সকালে স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সংকল্প নেওয়ার জন্যে চৌপাটিতে লোকসমাগম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খুব কম লোকই এল। তারা শপথ গ্রহণ করল। সেদিন থেকে বরাবর প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছি যে, আন্দোলনে যত লোক সাড়া দেয়, গঠনমূলক কাজে তত লোক সাড়া দেয় না।

৭ই এপ্রিল দিল্লী ও অমৃতসরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। মথুরা ছাড়িয়ে একটি স্টেশনে গেলে আচার্য গিদোয়ানী এসে খবর দিলেন যে, আমার গ্রেপ্তার হওয়া নিশ্চিত। কিছু পরে পাঞ্জাবে প্রবেশ না করবার হুকুম আমার উপর জারী করা হ'ল। আমি সেই হুকুম অমান্য করায় আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে পুনরায় মথুরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে জনতাকে শান্ত রাখবার জন্যে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। মথুরা থেকে আমাকে বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বোম্বাই পৌঁছেই খবর পেলাম যে, লোকেরা খুব উত্তেজিত হয়েছে এবং তাদের কথা শুনছে না। আমি তাদের কাছে গেলাম। আমাকে দেখে তারা খুব আনন্দিত হয়ে শোভাযাত্রা ক'রে "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে আকাশ ফাটাতে লাগল। রাস্তায় অশ্বারোহী পুলিস এসে বাধা দিল এবং বল্লম হাতে বেপরোয়া-ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে জনতাকে সরিয়ে দিতে লাগল। বহু লোক

আহত হ'ল। পুলিস ও জনতা উভয়ে যেন উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করতে লাগল। আমি এক ফাঁকে মোটর ছুটিয়ে পুলিস কমিশনারের কাছে পুলিসের এই আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, যেন লড়াই করবার জন্যে দলে দলে সৈন্য তৈরী রয়েছে। কমিশনারের কাছে অভিযোগ করায় তিনি বহুক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, অমৃতসর ও আমেদাবাদে বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। তিনি বললেন যে, আমিই এসবের জন্যে দায়ী। আমার উদ্দেশ্য ভাল হ'তে পারে, কিন্তু জনতা কখনও শান্ত থাকতে পারে না। আমি সে কথার প্রতিবাদ করলাম। আমার যুক্তির কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারলেন না। অবশেষে আমি সভা ক'রে জনতাকে শান্ত করবার জন্যে চৌপাটিতে গেলাম। সভায় সকলকে শান্ত থাকবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম। বললাম, "তা না হ'লে আমাকে সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে হবে।"

আমেদাবাদে গোলমালের খবর পেয়ে সেখানে গেলাম। সেখানে খুনজখম স্থরু হয়েছিল। বিরামগাঁওয়েও খুনজখম হয়। আমেদাবাদে গিয়ে দেখি, সামরিক আইন জারী হয়েছে এবং লোক অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়েছে। আমি কমিশনারের সঙ্গে দেখা ক'রে আলোচনা করলাম। তিনি তাতে খুব ক্রোধ প্রকাশ করলেন। আমি সামরিক আইন জারী করবার অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে বললাম এবং সভা ক'রে লোকজনকে শান্ত করব কথা দিলাম। ফলে ১৩ই এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে আহূত এক সভায় জনতাকে তাদের

দোষ দেখালাম ও প্রকৃত অপরাধীদের দোষ স্বীকার করতে বললাম। আমি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজে তিন দিন অনশন করার সংকল্প জানালাম ও অপর সকলকে একদিন অনশন করতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার কথাও ঘোষণা করলাম। অচিরে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হ'ল।

(১২) হিমালয়-তুল্য ভুল ঃ—আমেদাবাদ থেকে আমি নড়িয়াদে গেলাম। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি এক সাংঘাতিক ভুল হয়েছে। আমেদাবাদে থাকতেই সে ভুলের পরিচয় কিছু কিছু পেয়েছিলাম। সেই হিমালয়-তুল্য ভুলটি এই—লোকে সাধারণতঃ শাস্তির ভয়ে আইন মেনে চলে। শাস্তির ভয় না থাকলে অনেক ভাল লোকও আইন মানতে সর্বথা চেষ্টা করে না। আইন না থাকলেও ভাল লোকেরা চুরি করবে না সত্য, কিন্তু রাত্রিতে বাইসাইকেলের বাতি জ্বালান ইত্যাদির মত নিয়মপালনে তারাও অবহেলা করবে। যখন আইন থাকুক বা না থাকুক, লোকে স্বেচ্ছায় নিজের কর্তব্য পালন ক'রে চলে, তখনই প্রয়োজন হ'লে আইন-ভঙ্গ করবার অধিকার তাদের জন্মে। সকলের হঠাৎ সে অধিকার আসে না, সেজন্যে বাছা বাছা শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে প্রথমে সত্যাগ্রহ চালান উচিত। এই ভুল স্বীকার করবার জন্যে অনেকে খুব হাসিঠাট্টা করল। কিন্তু আমি সর্বদা মানি যে, যখন আমি নিজের সর্ষপতুল্য দোষকে হস্তীর মত দেখব ও অপরের হস্তীপ্রমাণ মত দোষকে সর্ষপতুল্য দেখব, তখনই আমি নিজের ও অন্যের দোষ ঠিক ঠিক ভাবে আন্দাজ করতে পারব। বিশেষতঃ সত্যাগ্রহীর এই নিয়ম মেনে চলা অত্যাবশ্যক।

বোম্বাই পৌঁছে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে লাগলাম। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হ'তে লাগল। কিন্তু যেরূপ সাড়া পাব আশা করেছিলাম, তা পাওয়া গেল না। বুঝলাম, সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম ধীরে ধীরেই অগ্রসর হবে।

(১৩) পাঞ্জাবে ঃ—পাঞ্জাব থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইন জারী প্রভৃতি যে সকল গুরুতর ঘটনার সংবাদ আসছিল, তাতে পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠছিলাম। দীনবন্ধু অণ্ড্রুজ, মালব্যজী প্রভৃতিও বারবার সেই অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় খুব দেরী হয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া বড়লাটের অনুমতিও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে অনুমতি পাওয়া গেল। লাহোরে গিয়ে বিরাট অভ্যর্থনা পেলাম। লোকে যেন আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবের নেতারা অনেকেই জেলে ছিলেন। পণ্ডিত মতিলালজী, মালব্যজী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন তাঁদের স্থান নিয়েছিলেন। এঁরা ও অন্যান্য স্থানীয় নেতারা আমাকে একেবারে আপন ক'রে নিলেন। আমরা সরকার-নিযুক্ত 'হান্টার কমিটি' বর্জন করবার নির্দেশ দিলাম। তার বদলে সাধারণের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হ'ল। তাতে মতিলালজী, স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাস, আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীজয়াকর ও আমি ছিলাম। আমার উপর একটু অধিক দায়িত্ব চাপান ছিল। আমরা তদন্তকার্যের জন্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। এই সময় পাঞ্জাবের পল্লীগুলি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। পাঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা যেন আমার বহুকালের পরমাত্মীয়া ছিলেন। তাঁরা

রাশি রাশি হাতে-কাটা সুতো আমার সামনে এনে স্তূপ ক'রে দিতেন।

তদন্ত করতে গিয়ে সরকারী অত্যাচারের যে নমুনা পেলাম, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ১৩ই এপ্রিল 'বৈশাখী মেলা' উপলক্ষে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বহু লোক সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার তাদের উপর গুলি চালিয়ে শত শত লোককে হতাহত করে। এরই নাম জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। যাঁরা এ সম্পর্কে বিস্তৃত খবর জানতে চান, তাঁদের কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়া উচিত। রিপোর্টের একটি কথাও মিথ্যা বা সন্দেহজনক ছিল না। এই রিপোর্টেই প্রমাণ হবে যে, ব্রিটিশ সরকার নিজের অধিকার বজায় রাখবার জন্যে কি অমানুষিক কাজই না করতে পারে। রিপোর্টের একটি কথাও আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

(১৪) কংগ্রেসে প্রবেশ :—এর আগে সামান্য সৈনিকের মতই কংগ্রেসে ছিলাম। এখন আমার উপর গুরুতর দায়িত্বের বোঝা পড়ল। মতিলালজী প্রভৃতি বড় বড় নেতারা আমাকে নিয়ে পরামর্শ করতেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ-স্মৃতিরক্ষার জন্যে টাকা তোলার ভার প্রধানতঃ আমার উপর পড়ল। বোম্বাই থেকে এজন্যে চমৎকার সাড়া পাওয়া গেল। হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলের রক্তেই জালিয়ানওয়ালাবাগের পবিত্র ভূমি রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এখন সকলের উপযোগী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা একটা সমস্যা হয়ে উঠল।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র তৈরির ভারও আমার উপরই দেওয়া হ'ল। আমি এ বিষয়ে তৎকালীন সর্বজনমান্য দুই নেতা—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ও লোকমান্য তিলকের বিশ্বাসভাজন দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিলাম। যে গঠনতন্ত্র তৈরী হ'ল, সে বিষয়ে আমার কিছু অভিমান আছে, আমি তা স্বীকার করি। সেই গঠনতন্ত্র ঠিক ঠিক অনুসৃত হ'লে কাজ হাসিল হয়ে যায়।

এইবার ঠিক ঠিক কংগ্রেসে প্রবেশ করলাম। সত্যাগ্রহ স্থগিত করবার পর গঠনমূলক কাজে মন দিলাম। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাঁতের উপর খুব নজর ছিল। ১৯১৫ সালে আশ্রমস্থাপনার পর চরকার উপর নজর পড়েছিল। তখন থেকে চরকার পুনরুদ্ধারে মন দিই। স্বর্গীয়া গঙ্গাবাঈ গ্রামে গ্রামে চরকার খোঁজ করেন। আশ্রমেও চরকা প্রবর্তন করা হয়। মগনলাল গান্ধী এজন্যে খুব পরিশ্রম করেন। প্রথমে খুব মোটা ও কম-চওড়া খাদিই তৈরী হ'ত। ক্রমে উন্নতি হ'তে লাগল।

(১৫) মিল-মালিকদের সঙ্গে :—বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের মালিকদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। তাঁরা খাদি-আন্দোলন সম্পর্কে অনেক তর্ক তুললেন। একজন মিল-মালিক বললেন, "স্বদেশী-আন্দোলনে আমরা বড়লোক হয়েছি। ভালো-মানুষ বাঙ্গালীরা স্বদেশীর মোহে অগ্নিমূল্যে দেশী কাপড় কিনেছে, মিল-মালিকেরা সেই সুযোগে শুধু যে দু-পয়সা করেছে তাই নয়—বিলাতী মালকেও স্বদেশী ছাপ দিয়ে চালিয়েছে। সুতরাং, এভাবে স্বদেশী করলে আপনিও নিরাশ হবেন। তার চেয়ে যাতে আরও কাপড়ের কল বাড়ে এবং দেশী কাপড়ের দ্বারাই ভারতের চাহিদা মেটে, সেই চেষ্টা করা উচিত। তাতেই

বিলাতী কাপড়ের আমদানি বন্ধ হবে।” আমি বললাম, “আপনারা কাপড়ের কল বাড়াতে হয় বাড়ান; কিন্তু আমার ব্রত তা নয়। আমি কাপড়ের কলের এজেন্ট হ'তে চাই না। আমি অর্ধবেকার গরীবদের হাতে কাজ দিতে চাই। কলের দ্বারা খুব কম লোকই কাজ পাবে। আর চরকা লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ ও পেটের ভাত জোগাবে। সুতরাং, আমি চরকা ও তাঁত চালাবার সংকল্প নিয়েছি। এই আন্দোলন সুরু হয়েছে মাত্র। এর পরিণাম কি হবে তা কে জানে?” মিল-মালিকেরা বললেন, “আপনার ব্রত যদি এই হয়, তবে আমাদের কিছু বলবার নেই। যদিও এই যন্ত্রযুগে চরকার সফলতা সন্দেহজনক, তবু চেষ্টা ক'রে দেখুন।”

## পূর্ণাহুতি

এখন এই অধ্যায়গুলি বন্ধ করবার সময় এসেছে। এর পরে আমার জীবন এত সার্বজনিক হয়ে গেছে যে, লোকে সে সম্পর্কে কিছু জানে না—এটা অসম্ভব। অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম, নাগপুর কংগ্রেস, খিলাফত সম্পর্কীয় প্রশ্ন, অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আনয়নের চেষ্টা এসব কথার উল্লেখমাত্র এখানে করছি। আর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমি কংগ্রেসী নেতাদের এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছি যে, এমন কোন বিষয় নেই, যার যথার্থ বর্ণনা তাঁদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে করা যায়। এই সব বিষয়ের স্মৃতি এখনো তাজাই আছে। শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, লালাজী ও হাকিম সাহেব আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবু সৌভাগ্যবশতঃ অন্য বহু

নেতা জীবিত আছেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসবার পর ইতিহাসও সবেমাত্র তৈরী হচ্ছে। আমার প্রধান প্রধান পরাক্ষা কংগ্রেসের ভেতর দিয়েই হয়েছে। এজন্য ঐ সব পরীক্ষার বর্ণনা করবার সময় নেতাদের উল্লেখ করা অপরিহার্য। ঔচিত্যের দিক থেকেও এইসব কথার বর্ণনা আমার এখনই করা ঠিক নয়। আর যেসব পরীক্ষা এখনো চলেছে, সেগুলি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তকে এখনো নিশ্চয়াত্মক বলা যায় না। এজন্যও অধ্যায়গুলি আপাততঃ বন্ধ ক'রে দেওয়া কর্তব্য ব'লে মনে করছি। যদি একথা বলি যে, আমার লেখাই অগ্রসর হ'তে চাইছে না—তাহলেও অত্যুক্তি হবে না। পাঠকদের কাছে বিদায় নিতে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে আমার পরীক্ষাগুলি এখনো মূল্যবান। জানিনা, আমি তার বর্ণনা যথার্থভাবে করতে পেরেছি কি-না। আমি নিজের দিক থেকে তা যথার্থভাবে বর্ণনা করতে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আমি সত্যকে যেরূপে দেখেছি ও যে পথে দেখেছি, সেইরূপে ও সেই পথেই বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের কাছে ঐসব বর্ণনা রেখে আমি নিজের চিত্তে শান্তি অনুভব করেছি—কেননা পাঠকদের কাছে আমি এই আশা করি যে, ঐগুলি পড়লে পাঠকদের হৃদয়ে সত্য ও অহিংসার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে।

আমি সত্যকেই পরমেশ্বর মনে করি। যদি এই অধ্যায়গুলির পাতায় পাতায় পাঠকদের এই ধারণা না হ'য়ে থাকে যে, সত্যময় হওয়ার জন্যে অহিংসাই একমাত্র রাজপথ, তা হ'লে

আমি নিজের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ মনে করব। চেষ্টা ব্যর্থ হয় হোক, কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নিরর্থক নয়। আমার অহিংসা খাঁটি হ'লেও কাঁচা, অপূর্ণ। এজন্যে আমার সত্যদর্শন হচ্ছে সেই সত্যরূপী সূর্যের তেজোরাশির একটি মাত্র কিরণকে দেখা, হাজার হাজার কৃত্রিম সূর্যের তেজ একত্র করলেও সে সূর্যের তেজের পরিমাপ করা যায় না। কাজেই আমার এ পর্যন্ত প্রয়োগের ভিত্তিতে এটুকু আমি অবশ্য বলতে পারি যে, এই সত্যের সম্পূর্ণ দর্শন সম্পূর্ণ অহিংসা ব্যতীত সম্ভব নয়।

এইরূপ ব্যাপক সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের জন্যে প্রাণিমাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেম অত্যাবশ্যক। এই সত্য লাভ করতে চায়, এমন মানুষ জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকেই বাইরে থাকতে পারে না। এই কারণেই আমার সত্য-পূজা আমাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেছে। যিনি বলেন যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, তিনি ধর্ম কি তা জানেন না। আর আমার বিশ্বাস এই যে, আমি এই কথা ব'লে কোন প্রকারে বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন করছি না। আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রাণিমাত্রের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা যায় না। আর আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংস ধর্ম পালন করাও সর্বদা অসম্ভব। কেননা অশুদ্ধাত্মা পরমাত্মার দর্শন করতে অসমর্থ। এজন্য জীবন-পথের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। এই প্রকারের শুদ্ধি সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে এত

নিকট সম্বন্ধ আছে যে, একের শুদ্ধি অনেকের শুদ্ধির কারণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত চেষ্টা করবার শক্তি তো সত্যনারায়ণ সকলকে জন্ম থেকেই দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি পলে পলে অনুভব করছি যে, শুদ্ধির এই পথ কঠিন। শুদ্ধির অর্থ হচ্ছে কায়মনোবাক্যে নির্বিকারভাব হওয়া, রাগদ্বেষাদি-রহিত হওয়া। নির্বিকারভাব পাওয়ার জন্যে প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা ক'রেও আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি নি। এজন্যে লোকের প্রশংসা আমাকে ভোলাতে পারে না। বরং তা বহু প্রকারে আমার দুঃখের কারণ হয়। আমি তো মনের বিকারগুলি জয় করাকে অস্ত্রযুদ্ধে সমস্ত জগৎ জয় করবার চেয়েও কঠিন মনে করি। ভারতে আসবার পরও আমি আমার মধ্যে লুক্কায়িত বিকার-সমূহকে দেখতে পেয়েছি। দেখে আমি লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু আমার সাহস বিনষ্ট হয় নি। সত্যের প্রয়োগ করতে গিয়ে আমি যে সুখ পেয়েছি, আজও তা অনুভব করছি। তবু আমি জানি যে, আমাকে বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। এজন্যে আমাকে শূন্যবৎ হতে হবে। যতক্ষণ মানুষ ক্ষুদ্র হয়ে নিজেকে সবার ছোট মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি দূরে থাকে। অহিংসা হ'ল নম্রতার পরাকাষ্ঠা—নম্রতার চরম সীমা। আর এ কথাও অনুভবসিদ্ধ যে, এইপ্রকার নম্রতা ছাড়া কখনো মুক্তি পাওয়া যাবে না। এজন্যে এখন তো এরূপ অহিংস নম্রতা পাওয়ার জন্যেই প্রার্থনা করি এবং ঐ বিষয়ে সংসারের সহায়তা ভিক্ষা ক'রে আমি এই অধ্যায়গুলি শেষ করছি।

---

ree